অমানুষিক ৯

সিদ্ধপুরুষ ২১

সত্যি ডিটেকটিভ গল্প ২৭

ছারপোকা ৩৬

ট্র্যাফিক পুলিশ ৪৮

বিষে বিষ-অক্ষয় ৫৭

নন্দিনী ৬৩

নটবর পাল ৭১

ধন্বন্তরি ৭৮

অরবিন্দ গুহ

মামা বাড়ি

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫
মে, ১৯৫৮
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু
ছেপেছেন
সুশীলকুমার ঘোষ
মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলকাতা-৬
১.৫০

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রদ্ধাস্পদেষু
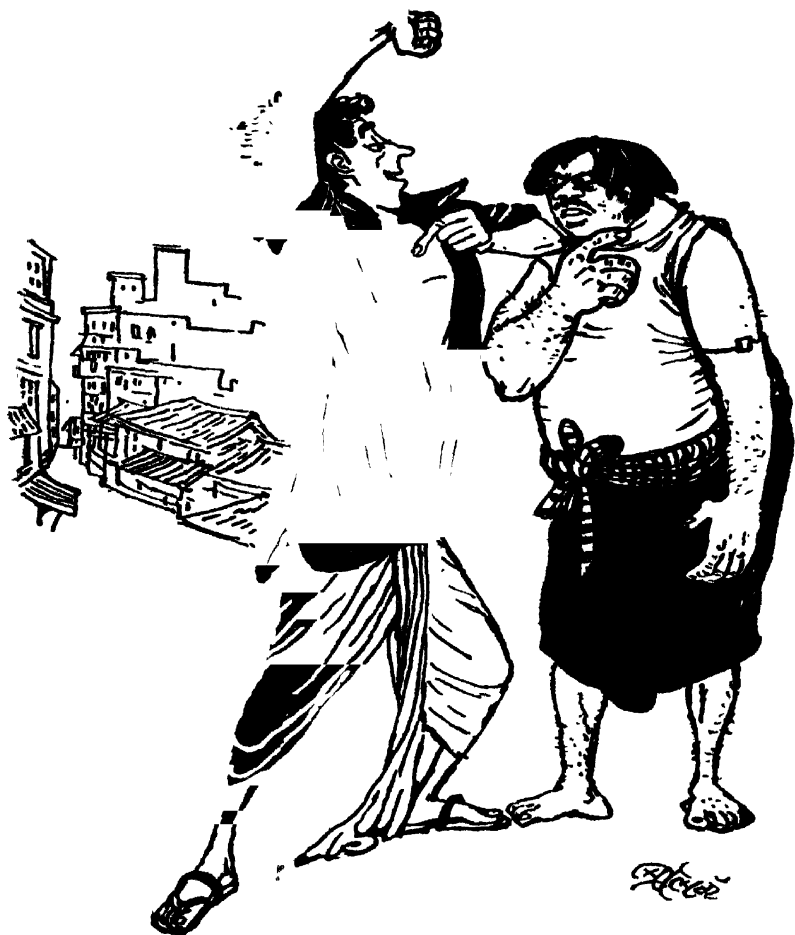
অমানুষিক

ছেলেবেলার সব বন্ধুই কিছু পরম সত্যবাদী নয়। অন্তত আত্মকাহিনী যখন বলে, তখন কতখানি ভেজালের সঙ্গে কতটুকু খাঁটি মিশিয়ে দেয় সে-বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। অন্যের কথা কী, আমি—হ্যাঁ, এই আমিও যদি এ লাইফে কখনও একখানা আত্মচরিত লিখি, তো আর কেউ না জানুক আমার আত্মীয়রা টের পাবেন কী পরিমাণ ভেজাল ছেড়েছি। না, ভুল বলা হল। হায়, আমার আত্মীয়রা আমাকে চেনেন। তাঁরা আমার লেখা পড়েন না। পড়বেনও না। নিরুপায় না হলে জেনে-শুনে কেই-বা ভেজাল গেলে?

কিন্তু যেটা এখন ছাড়তে যাচ্ছি, সেটা আমার আত্মকাহিনী নয়। আমার বন্ধুর কাহিনী। ভূতনাথের কাহিনী।

ভূতনাথ, আমি যদ্দুর জানি, বানিয়ে গল্প করে না। মানে, করতে পারে না। সে প্রতিভা ওর নেই। তবে যদি আর কারও মুখে শোনা কাহিনী ও নিজের বলে চালিয়ে গিয়ে থাকে তো সে-কথা আলাদা।

কাহিনীর শেষের দিকটাতেই অবিশ্যি আমার সন্দেহ। গোড়ার দিকটা আমি নিজেই সত্যি বলে জানি। শুধু আমি কেন, গোড়ার অনেকখানি জানেন না, এই কলকাতায় এমন চিত্ররসিক বাঙালী বিরল।

গোড়ার দিকে আমিও ছিলাম ভূতনাথের সঙ্গে।

ছবি আঁকায় ভূতনাথের কোনো নাম ছিল না তখন। পয়সাওলা লোকেরা ছবি-টবি কিনে বৈঠকখানার দেয়ালে টাঙান; কিন্তু তাঁদের

কাউকে ভূতনাথ তখন পর্যন্ত একখানাও ছবি গছাতে পারে নি। কেবলমাত্র এক নামজাদা ভদ্রলোক—না, তাঁর নাম বলব না—ভূতনাথের একখানা ছবি নিয়ে নিজের বৈঠকখানায় টাঙিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন—যদি অবিশ্যি ভূতনাথ ফ্রেমের খরচাটা দেয়। সেই সমঝদার ভদ্রলোক পয়সা দিয়ে ভূতনাথের ছবি কিনবেন? পাগল নাকি!

অন্যান্য আর্টিস্টরা ছবি এঁকে ঘড়ি-ফাউন্টেন পেন কিনছে, আর ভূতনাথ সে-সময়ে নিজের ঘড়ি-ফাউন্টেন পেন বেচে ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম কিনছে।

ভূতনাথকে তখন কেউ চেনে না, কেউ দেখতে চায় না। উঁহু, পাওনাদারেরা চেনে, দেখতেও চায়; কিন্তু সচরাচর দেখা পায় না।

তারপর একদিন ভুতনাথের একমাত্র মামা হার্টফেল হয়ে মারা গেলেন। তা ভদ্রলোক হঠাৎ হার্টফেল হতে গেলেন কেন? কারো-কারো মুখে শুনি, দুর্ঘটনার একটু আগে নাকি মামাকে ভূতনাথ নিজের আঁকা একখানি ছবি দেখিয়েছিল।

কিন্তু ভূতনাথ বলে—না ভাই, ওসব একেবারে ডাহা মিথ্যে। ছবি-টবি বাজে কথা, মামা সেদিন অবিশ্যি আমার হাতে একটা রঙের বাক্স দেখেছিলেন। তা, তোমার কি মনে হয় আমার হাতে একটা রঙের বাক্স দেখেই মামার হার্টফেল হয়েছে? তুমি কী বল?

না, আমি কিছু বলি না। হার্টফেলের ব্যাপারে ভূতনাথের কোন হাত নেই, কোন দোষ নেই। ও একেবারে খোদ ভগবানের হাত, আর মামার হার্টের দোষ।

আমি ডাক্তার নই, অতএব মামার হার্ট নিয়ে বেশি কিছু বলা আমার সাজে না। তবে হ্যাঁ, মামার অংন্তঃকরণটি অতি চমৎকার। অবিশ্যি মামার মৃত্যুর পরে পুরোপুরি উপলব্ধি করা গেল। একমাত্র মামা তাঁর একমাত্র ভাগ্নে ভূতনাথকে আড়াই হাজার টাকা দান করে গেছেন। ঐ আড়াই হাজার টাকা মামার সারাজীবনের সঞ্চয়।

সেদিন ভূতনাথ হু-হু করে কেঁদে সাত-আটটা তুলি ভিজিয়ে ফেলেছিল। আহা, আরও কিছুকাল বাঁচলে মামা নির্ঘাত আরও কিছু টাকা রেখে যেতে পারতেন।

কিন্তু এসব ফালতু কথা। আসলে হচ্ছে ঐ আড়াই হাজার টাকা। সেই টাকাটা দিয়ে ভূতনাথ এখন কী করবে?

ভূতনাথের বাড়িতে তু-বেলা তখন আত্মীয়-বান্ধবের ভিড়। তু-বেলা এসে তারা ভূতনাথকে সতেরো রকম সতুপদেশ দিচ্ছে, ভূতনাথও নাগাড়ে হুঁ-হুঁ করে যাচ্ছে। ভূতনাথ এটুকু নির্ভুল বুঝতে পেরেছে যে, উপদেশ ওদের উপলক্ষ্য, ওদের লক্ষ্য চা আর জলখাবার। থোক আড়াই হাজার টাকা পেলে, শুভার্থীদের এক-আধটু চা খাওয়াবে না— এটা কেমন কথা? কিন্তু সেদিকে ভূতনাথ ঠিক আছে, ঐ একটু মৌখিক হুঁ-হুঁ ছাড়া দ্বিতীয় কথাটি কয় না। আর্টিস্ট হলেও আত্মীয়-বান্ধবকে চা-জলখাবার খাইয়ে টাকা ওড়াবে, ভূতনাথ তেমন বুদ্ধু নয়।

তু-বেলা অম্লানবদনে উপদেশ শুনলে কী হবে, ভূতনাথ এদিকে পুরোনো পাওনাদারদের ঠিকমত ঠেকিয়েছে। দেনা মেটায় আর বলে—বিপদের টাইমে আবার আপনার কাছে যাব কিন্তু। আমার দিকে একটু তাকাবেন, মশাই।

টাকা গুনতে-গুনতে একজন পাওনাদার, কুনু মিত্তির, তখনই তাকিয়েছে ভূতনাথের দিকে—তাকাবো? আপনার দিকে? আবার?

ভূতনাথ একটু হুঁ-হুঁ করলে।

কিন্তু কুনু মিত্তির তো আত্মীয় নয়, পাওনাদার। ঐ হুঁ-হুঁ শুনে কি পাওনাদার ভোলে? সে বললে—উঁ-হুঁ, হুঁ-হুঁ নয়। আমার পায়ের দিকে একবার তাকান। জুতো দেখুন।

সে একেবারে বীভৎস দৃশ্য। জুতোর চামড়া ফুঁড়ে এ-পায়ের তুটো আর ও-পায়ের একটা আঙুল (বুড়োটা) বাইরে যেন রোদ পোয়ানোর জন্যে বেরিয়ে আছে।—আহা!

—এই একজোড়ার দশা দেখেই আহা করছেন? আপনার নাগাল পাবার জন্যে এর আগে আরও তিনজোড়া জুতো এমনি গুরুতরভাবে আহত অবস্থায়···! আবার আপনার দিকে তাকাবো? আমি, কুমু মিত্তির? আপনি হাসালেন ভূতনাথবাবু!

কুমু মিত্তির সেই ভাঙা জুতো খপ্-খপ্ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। ভূতনাথ তখন হুঁ-হুঁ ভাঁজতে-ভাঁজতে আর-একজন পাওনাদার নিয়ে পড়েছে।

তা, পাওনাদার ঠেকাতেই বারোশো টাকা বেরিয়ে গেল। আরও চারশো গেল ইদিক-উদিক হয়ে। বাকি থাকল ন-শো টাকা। এই ন-শো টাকা দিয়ে ভূতনাথ করবে কী?

আত্মীয়-বান্ধবদের হিতোপদেশের বাই কিন্তু তখনো কমে নি। এখনো ন-শো টাকা আছে। আর, কে না জানে, আত্মীয়-বান্ধবেরা সহসা আশা ছাড়ে না?

হেনকালে একদিন ভূতনাথ আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। হাতে তার ন-শো টাকার থলি।

ভূতনাথ বললে—কী রে, তুই একবারও আমার বাড়ি গেলি না? তুই না আমার বন্ধু? তোকে না আমি চা আর কড়াইশুঁটির কচুরি খাওয়াতাম?

—তা খাওয়াতিস। কিন্তু কেন যাইনি সে-দুঃখ তুই বুঝবি না, ভুতু! আমার পুরোনো অম্বলের ব্যামোটা ভয়ঙ্কর বেড়ে উঠেছে। চা-টা খেতে ডাক্তার আমাকে পই-পই করে বারণ করে দিয়েছে, খালি পেঁপে-সেদ্ধ খেতে বলেছে। তবে আর কেন তোকে খামাখা কতকগুলো উপদেশ শোনাতে যাই?

অতি কষ্টে চোঁয়া ঢেঁকুর চেপে রেখে আমি মস্ত একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম।

ভূতনাথ আমার হাত চেপে ধরল। বললে—কিন্তু তুই আমাকে নিরাশ করিস না ভাই। একটা পরামর্শ চাইব, দিবি? অম্বল

নিয়ে দুঃখ করিস না, তোকে আমি পেট ভরে পেঁপে-সেদ্ধ খাওয়াবো।

জীবনে যা কেউ কখনো নেয় নি, ভুতনাথ সত্যি-সত্যি তাই নিল। সাড়ে আট-শো টাকায় কিনে ফেলল একটা ঘর। একটা আর্টিস্টের স্টুডিও।

এই স্টুডিওর একটু ইতিহাস আছে। একজন আর্টিস্ট—কৈলাস তালুকদার—ঐ স্টুডিওটি করেছিলেন নিজের জন্যে। স্টুডিওটির চারদিক গাছপালায় আচ্ছন্ন। সেই জঙ্গুলে এলাকার মধ্যিখানে বলে দিনমানেও এমন অন্ধকার যে আলো না জ্বেলে কোন কাজ করা যায় না। স্টুডিওটির তিন দেয়ালে তিনটি বড়-বড় জানলা, তিনটিরই কপাট ভেঙেচুরে একাকার।

কেন জানা যায় না, কৈলাস তালুকদার এক রাত্রে এই স্টুডিওতেই গলায় দড়ি দিলেন। এই স্টুডিওতে বসেই পর-পর দুখানা চমৎকার ছবি এঁকে অনেক নাম করেছিলেন কৈলাস তালুকদার। মোটা দামে ছবি-দুখানা বিকিয়েছিল। সমস্ত সমঝদার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ছবি-দুখানার।

আর্টের প্রশংসা করলে হবে কী, আর্টিস্টের আত্মহত্যার পরে স্টুডিওটি কেউ কিনতে রাজি হল না। ও-ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে। তা না হলে কৈলাস তালুকদারের মত একজন আর্টিস্ট অযথা ওখানে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে যাবে কেন? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও এ কথা একটা গাড়োয়ান পর্যন্ত বোঝে যে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুললে খুব পুলক লাগে না।

ভূতে আজকাল কেউ বিশ্বাস করে না। তা-বলে একটা সন্দেহ-জনক কিম্ভূত ঘর কিনতেই বা কে সহজে রাজি হয়? না, শস্তায় পেলেও না। শস্তার হরেক অবস্থা।

আর, আমার বিবেচনায়, এই হল গিয়ে ভূতনাথের সুযোগ। দিব্যি দাঁওয়ে স্টুডিওটি পাওয়া গেল, ভূতনাথ ওখানে বসে আপন মনে সাধনা করুক। ভূতনাথের মাথায় যখন ছবি আঁকার ভূত আছে, তখন আমি বলি কি, এই কিম্ভুত স্টুডিওটিই ভূতনাথের পক্ষে প্রশস্ত।

ভূতনাথ আমার পরামর্শ শুনল। সাড়ে-আটশো টাকায় কিনে নিল স্টুডিওটা।

তারপর ভূতনাথ এল আর-একদিন। আর-একটি পরামর্শ চায়। দিনের বেলায় সাধনা করলে কেমন হয় রে?

কেন, ভূতনাথের মুখে হঠাৎ দিনের কথা কেন?

—না, বলছিলাম কি, সারাদিন বসে ওখানে ছবি আঁকবো, সন্ধেবেলা দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ি চলে আসব। মানে, রাত্তিরটা······

মানে বুঝলাম। রাত্তিরটা ভূতনাথ ঐ স্টুডিওতে কাটাতে চায় না।

সেই ব্যবস্থাই হল। ভূতনাথ সারাদিন ওখানে বসে ছবি আঁকে, সন্ধের আগে চলে আসে।

দিন-পনেরো বাদে ভূতনাথ আবার আমার কাছে এসে হাজির। বললে—চল্ ভাই, এক্ষুনি চল্, ভারি আশ্চর্য কাণ্ড।

গেলাম ভূতনাথের সঙ্গে স্টুডিওতে। ভূতনাথ একখানা ছবি এঁকে ফেলেছে। ছবির মর্ম আমি কিছু বুঝি না। সে-বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব। এর মধ্যে কোন্ কাণ্ডটা যে ভূতনাথকে আশ্চর্য করেছে, তাও আমার বুদ্ধির অগম্য। ভূতনাথও আমাকে কিছু বললে না। সেই এক কথাই ভূতনাথ বার-বার বললে—ভারি আশ্চর্য কাণ্ড!

এবং তার কয়েকদিন পরে ভূতনাথ আবার এল। ঐ ছবিখানা খুব প্রশংসা পেয়েছে চিত্ররসিকদের কাছে। কলুটোলার মহারানী ছবিখানা কিনে নিয়েছেন বারো হাজার টাকায়।

—অ্যাঁ! কত টাকায়?

টাকার অঙ্ক শুনে আমি প্রায় চেয়ার উল্টে পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি!

ভূতনাথ একটু হাসল।—বারো হাজার শুনেই ঘাবড়ালি? তেমন-তেমন ছবির এক-একখানার দাম কত হয়, সে-বিষয়ে তোর কোন ধারণা আছে?

নেই। কিন্তু তাই বলে ভূতোর ছবির দাম বারো হাজার টাকা! ওর অর্ধেক টাকায়, আমার বিশ্বাস, স্বয়ং ভূতনাথকেই কেনা যায়।

ভারি আশ্চর্য কাণ্ড!

একটি শর্তে ভূতনাথ আমাকে সেই আশ্চর্য কাণ্ডটা খোলাখুলি বলতে রাজি আছে। আমি আর কাউকে বলতে পারব না। তা, আমার আর কাউকে বলতে বয়ে গেছে!

ভূতনাথ বললে—সবচেয়ে আশ্চর্য কাণ্ড কী, জানিস? যে-ছবি নিয়ে দেশব্যাপী এত হৈ-চৈ, যে ছবি বারো হাজার টাকায় বিক্রি হয়, সে-ছবিটা—সে-ছবিটা···আমাকে এক গ্লাশ জল দিবি?

এক গ্লাশ জল খেয়ে ভূতনাথ বললে—সে-ছবিটা পুরোপুরি আমার আঁকা নয়।

—অ্যাঁ! আর কে এসে এঁকে দিয়ে গেল ভুতো?

আমার প্রশ্ন শুনে ভূতনাথের মুখ কালিবর্ণ হয়ে গেল।—সঠিক বলতে পারি না, কে! গোড়া থেকে ঘটনাটা বলি তোকে। দিনের বেলা ছবি এঁকে তো আমি সন্ধের সময় বাড়ি ফিরে আসি। একটু-একটু করে ছবিটা আঁকছিলাম ওখানে বসে। সাজ-সরঞ্জাম সমেত ছবিটা স্টুডিওতেই থাকে, ওসব কে আর ঘাড়ে করে নিত্যি-নিত্যি নিয়ে আসে? একদিন সকালে গিয়ে দেখি,—আশ্চর্য, ভারি আশ্চর্য কাণ্ড! আট দিনে আমি যেটুকু এঁকেছি, একরাত্রে তার অনেক বেশি করে কে যেন এঁকেছে বিচিত্র রঙে-রেখায়! অনেকদিন থেকে তো আমি ছবি আঁকি, কিন্তু সেদিন সে-ছবির আমি কোন অর্থ বুঝতে পারলাম না। কেবল একটা জিনিস বুঝলাম। এই

ছবিখানির সঙ্গে কৈলাস তালুকদারের ছবি-দুখানার ভঙ্গি অনেকখানি মেলে।

এতক্ষণ যেন একটা একটানা ভূতের গল্প শুনলাম ভূতনাথের মুখে। আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। আমি বললাম—ভুতু, তোর কি বিশ্বাস যে কৈলাস তালুকদারের প্রেতাত্মাই···

ভূতনাথ হাতজোড় করে বললে—না ভাই, এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন নেই। আমি হতবুদ্ধি হয়ে আছি। আর-একখানা ছবিতে হাত দিয়েছি, দেখি এখানার কী দশা হয়।

দ্বিতীয় ছবিখানার বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটল। রাত্রির অন্ধকারে অজানা হাতের স্পর্শে ছবিখানার চেহারা বদলে গেল।

ছবির বাজারে আদিত্য মজুমদার একজন জঁাদরেল সমালোচক। তিনি পর্যন্ত বললেন—এ ছবি অপরূপ। এ ছবির পূর্ণ অর্থ বুঝতে হলে যে প্রতিভার প্রয়োজন, সে এখনো জন্মায় নি। তবে এটা অনায়াসে বলা যায় যে, এ-ছবি যুগান্তরকারী, এ-ছবির মধ্যেই আনন্দবাজার আছে। কৈলাস তালুকদার ছবিতে যে-ভঙ্গি আরম্ভ করেছিলেন, দেহত্যাগের জন্য তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। আশা হয়, ভূতনাথবাবু কৈলাস তালুকদারের অসমাপ্ত কাজ সার্থকভাবে শেষ করে পৃথিবীতে একটা স্থায়ী কীর্তি রেখে যেতে পারবেন।

দ্বিতীয় ছবিখানাও মোটা দামে বিক্রি হল। একুশ হাজার টাকায় কিনলেন ধর্মতলার রাজকুমারী।

আর, ভূতনাথের কী খাতির! দিগ্বিদিকে সম্বর্ধনা-সভা। গাদা-গাদা ফুলের মালা। কাগজে কাগজে ভূতনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কলাবাগানের মহারাজা ভূতনাথকে একখানা গাড়ি উপহার দিলেন আর লেক-পাড়ায় একটা তিনতলা বাড়ি উপহার দিলেন ঝিঙেখালির রাজার আপন মাস-শাশুড়ি।

ভূতনাথ আর কোন্ দুঃখে হাঁটবে? গাড়ি চেপে এল আমার

বাড়িতে। এত সব হচ্ছে, তবু ভূতনাথের মুখ সব সময়ে কালো। ভূতনাথ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

ভূতনাথ বললে—বুঝলি রে, মনে আমার একবিন্দু সুখ নেই। এত সব হলে কী হবে, আসলে যে সবই ফাঁকি। ছবি তো আর পুরোপুরি আমি আঁকি নি!

—তাতে কী? আজ মৃগেন সামন্ত তোর ছবি সম্পর্কে লিখেছে, দেখেছিস?

—না, দেখি নি। মৃগেনবাবু অবশ্য পরশুদিন বলছিলেন যে লিখবেন। আমার ছবির মধ্যে নাকি পরলোকের নানারকম তত্ত্ব আছে।

হুঁ। আরও একটু লিখেছেন। তোর ছবির সম্পর্কে তোকে কিছু প্রশ্ন করলে তুই নাকি একটু হেসে সব প্রশ্ন নস্যাৎ করে দিস। তা, মৃগেন সামন্ত তোকে সাপোর্ট করেছে। পরলোকের রস পেলে সব কিছু নস্যাৎ না করে নাকি উপায় থাকে না। মৃগেন সামন্তর বদ্ধমূল বিশ্বাস, ঐ রসের স্বাদ পেয়েই কৈলাস তালুকদার সব কিছু ছেড়ে…

আমার সব কথা শুনেছে কি না কে জানে, ভূতনাথ হঠাৎ হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। বললে—ওরে, এত সব হলে কী হবে, আমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব গুলিয়ে যাচ্ছে, আমি একটা ভ্যাড়াকান্ত হয়ে গেছি।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করলাম। গম্ভীর মুখে বললাম—ভুতু, তোর টাকাকড়ি হয়েছে বলে ভাবিস না যে মিথ্যে বলে তোর মন রাখব। দুঃখ করিস না, কাঁদিস না; তোর নতুন কিছু হয় নি—যেমন ছিলি তেমন ভ্যাড়াকান্তই আছিস, তেমন ভ্যাড়াকান্তই চিরকাল থাকতে পারবি। যাক গে, নতুন কোন ছবি আরম্ভ করেছিস?

—হ্যাঁ, আজ সকালেই আর-একখানা আরম্ভ করেছি।

কিন্তু সে-ছবিখানা ভূতনাথ আর শেষ করতে পারে নি। ভূতনাথ নিজের হাতে সে-ছবিখানার দফা শেষ করেছে।

এসব অবশ্যি আমার শোনা কথা। তারপর ভূতনাথ ছবি আঁকা ইহজীবনের মত ছেড়ে দিয়েছে। ওসব সূক্ষ্ম লাইনের সঙ্গে ভূতনাথের আর কোন সম্পর্ক নেই। এখন ভূতনাথ প্রকাণ্ড এক ভুষিমালের আড়তদার।

তাহলে কি ভূতনাথের ছবির থেকে ভুষিমাল বেচে বেশি আয় হচ্ছে? ছবির ভূত হঠাৎ ভূতনাথের ঘাড় থেকে কোন্ মন্ত্রে নামল? সেই স্টুডিওটায় এখন কোন্ কম্ম হয়?

আর থাকতে না পেরে একদিন গেলাম ভূতনাথের আড়তে। খদ্দের-পত্র বিদেয় করে আমাকে নিয়ে ভূতনাথ ঢুকল গুদামের মত একটা বুক-চাপা অন্ধকার ঘরে। ওটা ওর খাসকামরা।

আমি বলতে আরম্ভ করলাম—ভুতু···!

ভূতনাথ আমার হাত চেপে ধরলে—বলছি। সব কথা তোকে বলছি। কিন্তু আমায় কথা দে···

কথা দিলাম, এসব অত্যন্ত গোপন রাখব। কাউকে বলব না। মরে গেলেও না।

ব্যাপারটা ভূতনাথ খুলে বললে। ভারি আশ্চর্য কাণ্ড!

তৃতীয় ছবিটা যখন ভূতনাথ আঁকতে শুরু করে তখন ভূতনাথের মনে ঘোরতর অশান্তি। যে ছবি পুরোপুরি সে নিজে আঁকে না, সেই ছবি নিজের আঁকা বলে চালিয়ে হাজার হাজার টাকা আয় হচ্ছে, দিগ্বিদিকে খ্যাতি ছড়াচ্ছে, বাঘা-বাঘা সমালোচকেরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েও স্বীকার করছে যে ছবির অর্থ সবখানি বোঝা যাচ্ছে না এবং সে-দোষ আর্টিস্টের নয়, তাঁদের। একমাত্র মৃগেন সামন্ত সাব্যস্ত করেছেন যে এ ছবির মধ্যে পরলোকের তত্ত্ব নিহিত।

অথচ ভূতনাথ কিন্তু ও-সব কিছুই বোঝে না। হায়, বুঝবে কেমন করে? ও-ছবির কতটুকু সে নিজে এঁকেছে? অস্পষ্টভাবে একটা সন্দেহ হচ্ছিল ভূতনাথের। সে-সন্দেহ আরও গাঢ় করলেন দুজন নামজাদা সমালোচক—আদিত্য মজুমদার আর মৃগেন সামন্ত।

তাহলে ভূতনাথের সন্দেহই যথার্থ। এ নিশ্চয়ই সেই কৈলাস তালুকদারের প্রেতাত্মার কীর্তি। লোকটা মরে গিয়েও ছবি ভুলতে পারে নি, ছবির ভূত হয়ে আছে।

তা, ভূতের মধ্যেও তো ভালো-মন্দ আছে। কৈলাস তালুকদার বজ্জাত টাইপের ভূত নয়, ভালো জাতের ভূত। ভূতনাথ ভাবল—তা না হলে সে আমায় ছবি এঁকে দিয়ে গাদা-গাদা টাকা পাওয়াচ্ছে কেন?

উপকারী ভূতকে ভয় করবার কোন অর্থ হয় না। বরং তাকে পুজো করা উচিত। তাকে বলা উচিত—কৈলাসবাবু, আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। আমি নরাধম ভূতনাথ, আপনার জন্যে কী করতে পারি? কী করলে আপনি খুশি হন?

তাই একরাত্রে ভূতনাথ স্টুডিওতেই রইল। আলো নিভিয়ে সুইচের কাছে ঘাপটি মেরে বসল। অন্ধকার না হলে হয়ত কৈলাস তালুকদার আসবে না। তাঁর আসার আভাস পেলেই ভূতনাথ সুইচ টিপে ঘর আলো করে ফেলবে। যা বলবার গড়গড় করে বলে যাবে।

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, কোনো সাড়াশব্দ নেই। কোটি-কোটি মশার কামড়ে ভূতনাথের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল, সরসর করছে নিশুতি রাতের হাওয়া, মাঝে মাঝে রাত-চরা পাখির ভয়াবহ চিৎকার। একটানা গুরু-গুরু ধ্বনি কানে বাজল ভূতনাথের। ও শব্দ কোত্থেকে আসছে? ভাল করে কান পাতল ভূতনাথ। শেষপর্যন্ত টের পেল। ধ্যেৎ! ও কিছু না। ঐ গুরুগুরু নিজের বুকের মধ্যেই শুরু হয়েছে।

এদিকে রাত যে প্রায় কাবার হয়ে এল! প্রেতাত্মারা বুঝি সব টের পান! হয়ত কৈলাস তালুকদার টের পেয়েছেন যে আজ রাতে ভূতনাথ স্টুডিওতেই আছে। হয়ত মানুষকে ওঁরা বিশ্বাস করেন না। হয়ত উনি আজ আর আসবেন না।

কিন্তু খানিক বাদেই কেমন একটা আওয়াজ হল। কে যেন এসেছে!—কে? কে?

ভূতনাথের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠল, নিশ্বাস পড়তে লাগল বড়-বড়। এসেছে—এসেছে। উচিত কথাগুলো বলবার সময় এসেছে! ভূতনাথ নিঃশব্দে ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল।

খস্‌খস্‌—খস্‌খস্‌—খস্‌খস্‌। সেই শব্দ লক্ষ্য করে ভূতনাথ তাকালো। অস্পষ্টভাবে দু-খানা হাত দেখা যাচ্ছে। একসঙ্গে একজোড়া হাত ভূতনাথের সেই অসমাপ্ত ছবিখানায় ঝপাঝপ দুটো তূলি চালাচ্ছে। আশ্চর্য, একসঙ্গে দুটো তূলি! হে সুদক্ষ শিল্পী, তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার!

তখন ভূতনাথ সুইচ টিপল। এক মুহূর্তে আলোয় ভরে গেল ঘর।

—তারপর? তারপর ভুতু?

ভূতনাথ আবার আমার হাত চেপে ধরল—বলছি। সব কথা তোকে বলছি। কিন্তু আমাকে কথা দে, কাউকে বলবি না, মরে গেলেও না?

—না, না। তুই কাকে দেখলি?

—কাকে দেখলাম?—ভূতনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তাকে দেখে আমার মনে হল চিত্র-সমালোচকগুলো এক-একটা গো-মুখ্যু। আদিত্য মজুমদার একটা গাধা, মৃগেন সামন্ত একটা কচ্ছপ।

—আঃ, খালি বাজে কথা! তুই কাকে দেখলি? কৈলাস তালুকদার…

—আরে ধ্যেৎ! কৈলাস তালুকদার না কচু! ভূতনাথ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে—কাকে দেখলাম, শুনবি? দেখলাম একটা ধুমসো বাঁদর। আলো জ্বালতেই বাঁদরটা তূলি-টুলি নিয়ে একলাফে একেবারে জানলা টপকে উধাও।

সিদ্ধপুরুষ

ক্রী-ী-ী-ী-ী-ী-ং-ং-ং-!

না, যত পারে বাজুক টেলিফোন! আজকের দিনের ভেতর এখন পর্যন্ত তিন-তিনটে রং-নাম্বার। কাঁহাতক আর সহ্য হয়! এবারে আর কিছুতেই না।

কিন্তু ক্রীং-নাদের ঠেলায় কানে তালা লাগবার জোগাড়। অগত্যা বাধ্য হয়েই অতনুকে রিসিভার তুলতে হল—হ্যালো, হ্যালো!

ফোনের ওধার থেকে একটা মিহি স্বর ভেসে এলো—আজ্ঞে, এটা কি প্রদ্যোত বাবুর বাড়ি? প্রদ্যোত সেন?

—হ্যাঁ। প্রদ্যোত বাবুকে আপনার দরকার? তা তিনি এখন বাড়ি নেই।—ঝাঁঝালো গলা অতনুর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জানি, ভালো করেই জানি। তা আপনি প্রদ্যোত বাবুর কে হন জানতে পারি কি?

—প্রদ্যোত বাবু আমার বড় ভাই।...তা, আপনাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারলাম না?

—আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি আপনার অচেনা একজন ভদ্রলোক। তা হ্যাঁ, দরকারটা আমার আপনাকে দিয়েই হবে।

—তা বেশ তো, বলুন না যা আপনার কথা! তা, একটু চট্‌পট্‌...

সেই ভদ্রলোকের দীর্ঘশ্বাসটা অতনুর কানে এসে বাজলো।—এ কি আর মশাই তাড়াতাড়ি করে বলবার মত কিছু! আমারো মশাই গত বছর এমনি একটা দুর্ঘটনায় একেবারে—

—কী হয়েছে? ব্যস্ততায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল অতনুর গলা।

—অত ব্যস্ত হয়ে লাভ কী বলুন! দুঃসংবাদ শোনবার আগে বুকটাকে কঠিন করে নিতে হয়, আর যে দেয় তারও সেটা আস্তে আস্তে ভাঙা উচিত।

অচেনা হিতাকাঙ্ক্ষীর হিতোপদেশটা খুব বেশি ভাল লাগল না অতনুর।

—আর দেখুন, বিধাতা পুরুষ কপালে যা লিখে রেখেছেন কার সাধ্য তার একচুল এদিক-ওদিক করে, কার সাধ্য তা খণ্ডায়?

—কী এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রদ্যোতের? প্রদ্যোতের কপালে বিধাতা পুরুষ কী এমন লিখে রেখেছেন যা এই অচেনা পুরুষটির অজানা নয়?

—দয়া করে যা বলবার বলে আমায় মুক্তি দিন, আর আমায় এমনি ভাবে দগ্ধে মারবেন না।—মিনতি-মাখা গলা অতনুর।

সেই ভদ্রলোকের স্বরটা ভারী হয়ে উঠল।—মুক্তিদাতা কি আমি! দগ্ধে মারা-না-মারা কি আমার হাতে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই আপনার হাতে, মুক্তিদাতা-টাতা সবই স্বয়ং আপনি।

আরো বেশ কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ও হিতোপদেশের পর ভদ্রলোক জানালেন—এই-মাত্তোর আপনার দাদা হাজরা রোডের মোড়ে মিলিটারি লরি চাপা পড়েছেন।

কান্নায় কাতর হয়ে উঠল অতনুর গলা—দাদা কি এখনো আছেন? তাঁকে কি এখনো হাজরা রোডের মোড়ে রাখা হয়েছে, না হাসপাতালে—?

—না, হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়ই পাই নি। চাপা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই—

রিসিভারটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে গায়ে জামা আর পায়ে স্যাণ্ডাল গলিয়ে বেরুবার মুখেই বাবার ডাক—এই অতনু, কোথা যাচ্ছিস?

কোথাও না…এই এমনি…মানে এই ইয়ে…মানে এমনি একটু …অতনু ধরা গলায় আমতা আমতা করতে লাগল।

তার চেয়ে এখানে বসে একটু প্রেত-তত্ত্বের মাহাত্ম্য শোন্। দ্যাখ কী লিখেছে এখানে! আজকালকার ছেলেরা তো ভূতে একদম বিশ্বাসই করিস না! অনুধ্বজ বাবু একখানা বিরাট প্রেততত্ত্বের বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন।

চুপ করে উসখুস মনে অতনু বসে-বসে প্রেততত্ত্বের মাহাত্ম্য শুনতে লাগল। কী করে এমন মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা সে দেবে! প্রেততত্ত্বের পঞ্চম সূত্রটা কেবল ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলেন, এমনি সময়ে দুহাতে মুখ ঢেকে অতনু ডুকরে কেঁদে উঠল।

—কী রে! কী হয়েছে!!—চশমার বেড়াজাল টপকে তাকালেন অনুধ্বজ বাবু।

—যা হবার নয় তাই হয়ে গেছে বাবা! দাদা এই-মাত্তোর হাজরা রোডের মোড়ে মিলিটারি লরি চাপা পড়ে—

—প্রদ্যোত লরি চাপা পড়েছে! প্র-দ্যো-ত!!

অনুধ্বজ বাবুর গলা চিরে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরুলো। আর তার সঙ্গে অতনুর বিলাপ।

রান্নাঘর থেকে অতনুর মা ছুটে এলেন। তাঁকে দেখে অনুধ্বজ বাবু চিৎকার করে উঠলেন—ওগো, আমাদের প্রদ্যোত আর নেই—! ব্যাপার বুঝে মা আছাড় খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কান্নাকাটি শুনে পাশের বাড়ি থেকে চাটুজ্জেমশাই ছুটে এলেন। ছুটে এলেন ভট্‌চায, গাঙ্গুলী, চক্কোত্তি, মুখুজ্জে আর বাঁড়ুজ্জের দল। মোট কথা, আশপাশের কেউ আর ছুটে আসতে বাকি রাখলেন না।

টিকি দুলিয়ে চাটুজ্জে বললেন—আহা, জীবন যে পদ্মপত্রে নীর সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায়! আহা-হা, প্রদ্যোতের সঙ্গে আজ সকালেও আমার কত কথা! আর সেই প্রদ্যোত কিনা এখন পরপারে!

সকলের দীর্ঘশ্বাসে ঘরের আবহাওয়াটা শোক-মলিন হয়ে উঠল।

কিন্তু কাঁদলেই তো আর অতনুর চলবে না! প্রদ্যোতের প্রাণহীন দেহ হয়ত এখনও রাস্তায় পড়ে। তাকেই সব করতে হবে। ভারী মনে অতনু হাজরা রোডের মোড়ের দিকে পা বাড়ালো।

—আরে মশাই, প্রদ্যোতের মত ছেলে—গাঙ্গুলীমশাই শুরু করলেন—হাজার থাক, লাখে কটা মেলে বার করুন দেখি?

হুঁকোয় একটা জবর টান মেরে চক্কোত্তি বললেন—ছেলে নয় মশাই, হীরের টুকরো, বলুন চাঁদের কণা—!

—কেঁদে আর কী হবে বলুন!—চাটুজ্জেমশাই অনুধ্বজবাবুর দিকে ঘুরে বললেন—আপনি তো বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনাকে আর কী বোঝাবো?

—তার চেয়ে বরং একটা কাজ করলে ভাল হয়—চক্কোত্তির পরামর্শ—আপনি সেদিন বলেছিলেন যে মরবার তিন ঘণ্টার মধ্যে হলে সাধনার জোরে আবার নাকি তাকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। তা দেখুন না আপনিই একবার চেষ্টা-চরিত্তির করে!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রেততত্ত্বের দশম পরিচ্ছদে আছে বটে অমনি একটা সূত্র! অনুধ্বজবাবু খাড়া হয়ে বসলেন।

বইএ দেওয়া ফর্দ-মত একশো টাকার একখানা নোট ভাঙিয়ে তক্ষুনি বাজার থেকে রকমারি জিনিসপত্তর আনা হল। পাঁঠা, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, ঘি, ময়দা, তিজেল, ধুনুচি, পিদ্দিম,—এ ছাড়া আরও অনেক কিছু।

অনুধ্বজবাবু পুজোয় বসলেন। পরনে তার রক্তবর্ণ কাপড়, গলায় উপবীত, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক রেখা।

চৈত্রের মৌমাছির মত গুনগুনানিটা নিমেষে থেমে গেল। সবাই চুপচাপ; মন্তরের জোরে সত্যি প্রদ্যোত ফিরে আসে কি না দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল—ঐ এসেছে, এসেছে!

—কে এসেছে? চক্কোত্তি মশাই একবার সেদিকে তাকালেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর বুকের রক্তই শুধু হিম হয়ে গেল না, অনুধ্বজবাবু যে সত্যি একজন সিদ্ধপুরুষ, এতেও সন্দেহ রইল না।

—বাবা, এসব কী!—চোখের সামনে দাঁড়িয়ে জলজ্যান্ত প্রদ্যোত।

কোনো উত্তর না দিয়ে প্রদ্যোতের দিকে একবার তাকিয়ে অনুধ্বজবাবু দু-ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলেন। তারপর আগের মত বিড়বিড় করে আবার মন্তর পড়তে লাগলেন।

কিন্তু এসব কী! প্রদ্যোত তো অবাক।

মা গুটি-গুটি এগিয়ে এসে প্রদ্যোতকে প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলেন, অমনি অনুধ্বজবাবুর এক ক্রুদ্ধ ধমক—সা-ব-ধা-ন! ওকে ছুঁয়েছ কি মরেছ! ওকে তো পাবেই না, নিজেও অমনি সেইসঙ্গে—

ধমকের ঠেলায় বসে পড়ে মা কলাপাতার মত কাঁপতে লাগলেন।

এককুঁজো মন্তর-পড়া বরফ-গলা জল অনুধ্বজবাবু ঝুপঝাপ করে প্রদ্যোতের গায়ে মাথায় ঢেলে দিলেন। তারপর বললেন—হুঁ, এবার ছুঁতে পারো।

মা প্রদ্যেতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

চাটুজ্জেমশাই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বাবা প্রদ্যোত, আসবার সময় তোমার কেমন লাগল ?

ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে প্রদ্যোত বললে—ট্রামে চেপে ধর্মতলা থেকে ভবানীপুর আসতে আবার কেমন লাগে ? এখন আপিস ছুটির টাইম, ট্রামে বড্ড ভিড়, এই যা।

—শোন কথা! পরলোক থেকে প্রদ্যোত ট্রামে করে এসেছে!

চক্কোত্তি মাথা নেড়ে বললেন—এমনি হয়। সবই মন্তরের গুণ। মন্তরের গুণে সব ভুলে যায় কিনা!

—কিন্তু ক্ষমতা বটে অনুধ্বজবাবুর! একেই বলে গিয়ে সিদ্ধপুরুষ!—সকলে এ কথা একবাক্যে মেনে নিলেন।

বিস্ময়ের ঘোর একটু কাটলে চক্কোত্তি বললেন—আজকালকার ছেলে-ছোকরারা তো এসব বিশ্বাসই করতে চায় না, কিন্তু দেখলে তো নিজের চোখে ? বলি দেখলে তো গাঙ্গুলী ?

সব কিছু দেখেশুনে অতনু তো হেসে কুটি-কুটি!

—আরে কিচ্ছু না, অনেকদিন আগে সেই যে দাদার মনিব্যাগটা চুরি গিয়েছিল না! যে তুলে নিয়েছিল সেই ব্যাটাই বোধহয় আজ হাজরা রোডের মোড়ে মিলিটারি লরি চাপা পড়েছে।···দাদার সেই ব্যাগটায় আবার নাম-ঠিকানা, ফোন-নাম্বার লেখা আছে কিনা! ওখানকার এক ভদ্রলোক তাই দেখে—

—তার মানে ? আমার এসব কিছু নয় ?—অনুধ্বজবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

—নয়ই তো! যত তত্ত্বই বলো, মরলে পরে আবার কাউকে বাঁচানো যায় নাকি!

বাঁড়ুজ্জে, চাটুজ্জে, মুখুজ্জে, গাঙ্গুলী আর চক্কোত্তি—সকলে তখন এ বিষয়ে একমত। সকলের হাসিতে ঘর ভরে উঠল।

অবশ্যি তার ফলে সেই একশো টাকার দই-সন্দেশের সদগতি হতে কোনো বাধা হল না।

কিন্তু এক-কুঁজো বরফ-গলা জল (তা সে যতই মন্তর-পড়া হোক না কেন) যদি শীতের বিকেলে গায়ে-মাথায় ঢেলে দেওয়া হয় তবে জ্বর না হয়ে উদ্ধার আছে ?

পরদিন প্রদ্যোতের একলার গায়ে দু-জনের জ্বর।

ডাক্তারে আর ওষুধে আবার করকরে পঁচিশ টাকা গেল বেরিয়ে।

মার কিন্তু সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল প্রেততত্ত্বের ওপর। ঐ প্রেত-তত্ত্বের নির্দেশ মানতে গিয়েই না বাছার এমনি দুর্দশা !···স্টোভে যে বার্লি জ্বাল দেবেন তার কোনো উপায় নেই, কারণ বাজারে স্পিরিট একদম পাওয়া যায় না।

কী মনে হতে আলমারি খুলে প্রেততত্ত্বের বইখানা এনে মা সেখানাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বার্লি জ্বাল দিতে লেগে গেলেন।

সত্যি ডিটেকটিভ গল্প

মিউ, মিউ, মিউ—উ-উ।

স্পষ্ট বেড়ালের ডাক। আমরা পাঁচজনে একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। গড়ের মাঠের এদিকটায় আমরা আরও অনেকদিন এসেছি, কিন্তু কই এখানে তো কখনো বেড়ালের ডাক শুনি নি। কোন্ বেড়ালের আবার এমন বেয়াড়া হাওয়া খাওয়ার সখ হল ?

তা ছাড়া আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যা একান্ত গোপনীয়। পাতা পড়লেও আমরা চমকে উঠতে পারি, বিষয়টা এমন। দেওয়ালের কান আছে বলেই আমাদের এতদূর আসা। কে বলতে পারে এই বেড়ালটাই কৃতান্ত মুখুজ্জের চর নয় ?

কে কৃতান্ত মুখুজ্জে ? কৃতান্ত মুখুজ্জেকে যদি তোমরা চিনতে তাহলে এসব কথা কিছুতেই তোমাদের বলতাম না।

আসল কথা কী জানো, ও-নামে কোনো লোকই নেই। ভদ্রলোকের আসল নাম ভাঁড়িয়ে আমি বানানো নামেই কাজ চালাচ্ছি। আসল নাম শুনতে চাও ? মাপ করো, আমি মরে গেলে তবে বরং ভূত হয়ে সে নাম বলবখন। তার আগে পারব না।

যাক সে, গোপন কথাটা বলি। আমাদের ইচ্ছে হয়েছে এবার পুজোয় আমরা পাড়ায় একখানা প্লে করব। নাটক ঠিক করে ফেলেছি—"রাবণ বধ"। পার্ট-টার্ট ভাগ-বাঁটোয়ারা—মায় মুখস্থ অবধি সারা, কিন্তু মুস্কিল বেধেছে চাঁদা নিয়ে। পুজোর চাঁদা থেকে থিয়েটার বাবদ একটি পাই-পয়সা দিতেও বটকেষ্টদার ঘোরতর আপত্তি। আমরা কত বোঝালাম ধর্মের ব্যাপার নিয়েই থিয়েটার

করা হবে, কত হ্যানো কত ত্যানো, কিন্তু বটকেষ্টদার সেই এক কথা —মা দুর্গার নামে তোলা টাকা থেকে আমি এক আধলা বাজে-খরচ হতে দেব না। পারো তো থিয়েটারের জন্যে পাড়ার থেকে আলাদা করে চাঁদা তোলো। তারপর তা দিয়ে ইচ্ছে হয় রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখাও, ইচ্ছে হয় কোরিয়ার যুদ্ধ দেখাও।

অতএব থিয়েটারের নামে চাঁদার খাতা বগলে নিয়ে ঘুরতেও কসুর করি নি। কিন্তু মুরারি উকিল, গুরুদাস মোক্তার, অপরেশ ডাক্তার, এমনকি নরহরি কোবরেজের মুখেও একই প্রশ্ন—কৃতান্তবাবু কি থিয়েটারের চাঁদা দিয়েছেন?

আরে আসল মামলাই তো সেখানে। কৃতান্ত মুখুজ্জের মুখখানা এমন যে, তার কাছে যাবার কথা উঠলেই আমাদের পেট কামড়াতে শুরু করে। ভদ্রলোক যে কখন কোন্ মেজাজে থাকেন! চাঁদার বদলে হয়ত চাঁদা করে থাপ্পড়ই দিলেন। আবার মেজাজ ভালো থাকলে···

কী উপায় করা যায়, তাই নিয়েই গড়ের মাঠের এখানে আমাদের শলা-পরামর্শ। কিন্তু অন্য উপায় নেই। যেতে হবে, যেতে হবে, যেতেই হবে রে! এমন সময় মিউ, মিউ, মিউ-উ-উ।

বেড়ালটাকে দেখেই তো গোপীকান্ত প্রথমে ভ্যাবাগঙ্গারাম মেরে গেল। আস্তে ঠোঁটের ওপর আঙুল তুলে ইসারা করলে, চুপ!

কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু একখণ্ড পাথরের সঙ্গে লাল ফিতে দিয়ে বেড়ালটা বাঁধা।

গোপীকান্তই প্রথম মুখ খুলল—আরে, এ যে কৃতান্ত মুখুজ্জের বেড়াল! এ বেড়াল এখানে এ অবস্থায় কেন?

সত্যি, এ একেবারে অভাবিত কাণ্ড! কৃতান্ত মুখুজ্জের অমন পেয়ারের বেড়াল! শুনেছি, সাহেব-পাড়া থেকে ছাপ্পান্ন টাকা খসিয়ে কৃতান্ত মুখুজ্জে এই কাবুলী বেড়ালটা জোগাড় করেছিলেন। আমরাই তো একদিন ভদ্রলোককে এই বেড়ালটা নিয়ে মোটরে হাওয়া খেতে দেখেছি।

যাকে বলে রীতিমত ঘনীভূত সমস্যা। এ-সমস্যার সমাধান বাংলা দেশে কে করতে পারে?

দু-জন পারেন। এক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, দুই শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত। নামদুটো আমিই বাতলে দিলাম।

জগমোহন বললে—ওসব বাজে কথা রেখে এখন কাজের কথা ভাব্। বেড়ালটা এখানে কেমন করে এল! তুই কী বলিস গোবিন্দ?

গোবিন্দ গম্ভীর। জটিল সমস্যার পনেরো আনা কিনারা করলে পাকা ডিটেকটিভদের অবস্থা বইয়ে যেমন হয় বলে পড়েছি, গোবিন্দর মুখখানা অবিকল তেমনি।

—বেড়াল কি নিজেকে ফিতে দিয়ে নিজে পাথরের সঙ্গে এমন-ভাবে বাঁধতে পারে?—গোবিন্দ আস্তে আস্তে রহস্য ভাঙছে।

—উহুঃ! নিশ্চয়ই কেউ একজন বেড়ালটাকে এখানে বেঁধে রেখে গেছে।

গোবিন্দ বললে—কে বেড়ালটাকে এখানে বেঁধে রেখে গেছে, আমি জানি।

গোবিন্দ বলে কী? শুনে আমার পর্যন্ত চোখজোড়া কপালে উঠে এল।—কে? কে?? কে???

একবার বেড়ালটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গোবিন্দ ঝাড়া সাত মিনিট চুপ করে রইল। তারপর শান্ত গলায় বললে—একজন দুর্বৃত্ত।

আর একটিও কথা না বলে আমি মুখ চুন করে বসে রইলাম। গোবিন্দ বলতে লাগল—ছেলেধরা কাকে বলে জানো? এরা বড়-লোকের ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়, তারপর চিঠি পাঠায়—যদি আপনার ছেলেকে ফেরৎ পেতে চান তো অমুক দিন, অমুক সময়, অমুক জায়গায় পাঁচশো টাকা নিয়ে যাবেন। বুঝতেই পারছ, বড়লোকের অনেক পাঁচশো টাকা থাকে, আর ছেলেধরার ব্যাপারটাও নেহাৎ

ছেলেখেলা নয়। অতএব, পাঁচশো টাকা দিয়ে ছেলেকে ফেরৎ নিয়ে আসতে হয়। বুঝতে পারছ?

গোবিন্দ বললে—এখন প্রশ্ন, বাবারা কেন গায়ের-রক্ত-জল-করা টাকা দিয়ে ছেলেদের উদ্ধার করে? বলতে পারো?

আমার কথাটা জগমোহনই দুঃখের সঙ্গে বললে—হাতের সুখের জন্যে। ছেলেদের পিঠের মতো অমন প্রশস্ত পিটোবার জায়গা পৃথিবীতে বাবারা আর কোথায় পাবে?

গোবিন্দ এবার জগমোহনের ওপর পড়ল—বোকার মত কথা বলিস নে জগমোহন! সব বাবাই কিছু তোর বাবার মত নয়। সেই জন্যেই সব ছেলেকে ছেলেধরায় ধরে না। তারা এমন ছেলেকেই

ধরে যার বাবা, সাধু ভাষায় যাকে বলে পুত্রবৎসল, স্নেহান্ধ। সোজা কথায় বলতে গেলে, যে বাবা ছেলেকে দু-দণ্ড চোখের আড়াল করতে পারে না, এ্যায়সা ভালবাসে। মানে, কারো ভালবাসার জিনিসটি, তা ছেলেই হোক আর যাই হোক, ধরে নিয়ে গিয়ে তারপর ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে সেটি ফেরৎ দিয়ে দেবে।

এতক্ষণে বেড়ালের রহস্য কিছু কিছু বোঝা গেল। কে না জানে কৃতান্ত মুখুজ্জে বড়লোক এবং এই বেড়ালটিকেও বড় কম ভালবাসেন না। সেই অজানা বেড়াল-ধরা দুর্বৃত্তটা ঠিকই আরম্ভ করেছিল, কিন্তু শেষ-রক্ষা বুঝি আর হল না। হয়ত কৃতান্ত মুখুজ্জে সাধের বেড়ালের শোকে এতক্ষণে কাহিল হয়ে পড়েছেন। এই হারানো বেড়াল আমরা যখন তাঁকে গিয়ে ফিরিয়ে দেব, তখন? মেজাজী মানুষ তো, তখন চাই-কি খুশি হয়ে আমাদের থিয়েটারে একটা মোটা চাঁদাই দিয়ে দেবেন। সন্দেহ কী, ভগবান আছেন! হিপ্ হিপ্ হুররে!

তারপর গোবিন্দর ইচ্ছেমতই সব করলাম।

অবশ্যি আরম্ভ গোবিন্দই করলে। প্রথমে গোবিন্দ পাথরের খণ্ড থেকে ফিতের দিকটা খুলে ফেললে। কিন্তু না, বেড়ালের বাঁধন খুলল না। ঐ ফিতেসুদ্ধই বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিলে। কিন্তু আচ্ছা বেড়াল বটে একখানা! কোথায় উদ্ধারকর্তার দিকে ভালোভাবে একটু তাকাবি, মিষ্টি করে হাতটা চেটে দিবি, তা না, উল্টে গোবিন্দর বাঁ হাতে খ্যাঁচ করে এক পেল্লায় থাবা বসিয়ে দিলি?

কিন্তু ছেলে বটে গোবিন্দ! মুখে তবু হাসি লেগেই আছে।— ও ভেবেছে আমিও বুঝি সেই দুর্বৃত্তদের একজন। আহা, বেচারি!

বেচারি চোখের পলকে আর-এক কাজ করে ফেললে। আর-এক থাবায় গোবিন্দর জামাটা একেবারে ফর্দা-ফাঁই; সঙ্গে-সঙ্গে গোবিন্দ বেড়ালটা কোল থেকে নামিয়ে দিলে, বললে—এক কাজ কর্ গোপীকান্ত। ট্রাম-ভাড়া বাদ দিয়ে সকলের পকেট মিলিয়ে মোট কত হবে রে?

পাঁচজনের ট্রামভাড়া পনেরো পয়সা বাদে সকলের পকেট ঝেড়ে-মুছে মোট হল এক টাকা সাড়ে এগারো আনা। তা দিয়ে গোবিন্দর হুকুমে কাবুলী বেড়ালের মেজাজ ঠাণ্ডা করবার জন্যে যেসব জিনিস আনা হল তা দেখে আমাদেরই জিভে গরম জল এল। বেড়ালটা চোখের সামনে সেগুলো আগাপাশতলা সাবাড় করলে।

শুধু কি তাই? ট্রামে আসতে আসতে গোবিন্দর গালে আর-একবার থাবা মেরে ইঞ্চিখানেক আঁচড়ে দিলে। অগত্যা জগমোহনের কোল। জগমোহনকে একটা থাবাই মোটে দিয়েছিল; কিন্তু সেই একটাই মোক্ষম। পেটের ওপরের খানিকটা চামড়া আর জামার দফাটি সেই এক আঁচড়েই গয়া। তারপর গোপীকান্ত। না, গোপীকান্তর জামা অটুট আছে, কিন্তু কাপড়ের কোঁচার অর্ধেকটাই নেই।

কৃতান্ত মুখুজ্জের বাড়িতে ঢোকবার আগে গোবিন্দই আবার বেড়ালটাকে কোলে নিলে। গোবিন্দরই অবশ্যি নেওয়া ঠিক। আসল বুদ্ধি কার শুনি? কৃতান্ত মুখুজ্জের প্রশংসার ফাঁকে তাল বুঝে থিয়েটারের চাঁদার কথাটা পাড়তে হবে কিন্তু। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আসল কথা ভুলে যাবে, এমন কাঁচা ছেলে নয় গোবিন্দ।

বাইরের ঘরে বসে কৃতান্ত মুখুজ্জে খুব মন দিয়ে কি যেন একখানা বই পড়ছিলেন। হয়ত কোন ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থের মধ্যে হয়ত ভদ্রলোক বেড়ালের শোক ভোলবার চেষ্টা করছেন। আহা রে!

গটগট করে গোবিন্দ কৃতান্ত মুখুজ্জের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। গদগদ গলায় বেড়ালটা ডাকল, মিউ, মিউ, মিউ-উ-উ। গোবিন্দর মুখে এক আশ্চর্য তৃপ্তির হাসি। চমকে উঠে ভদ্রলোক গোবিন্দর দিকে তাকালেন।

—বড়লোকটাকে কোত্থেকে আনলে?

—আজ্ঞে, দুর্বৃত্তের হাত থেকে আমরা, মানে—বলতে কী আমিই,

ওটাকে উদ্ধার করে এনেছি। জানি না কোন্ পাষণ্ড এ হেন কাবুলী বেড়ালকে গড়ের মাঠে একখণ্ড পাথরের সঙ্গে ফিতেয় বেঁধে বন্দী করে রেখেছিল। কী করুণ কান্না বেড়ালটার! উঃ, সে যে কী মর্মান্তিক দৃশ্য!—বলতে বলতে গোবিন্দ প্রায় কেঁদে ফেলে আর-কি!

—কবিতা! কবিতা!

কবিতা হচ্ছে কৃতান্ত মুখুজ্জের মেয়ের নাম। বাবার ডাক শুনে সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। মেয়েটি টিঙটিঙে হাড্ডিসার, কুচকুচে কালো, ঢ্যাঙঢেঙে লম্বা। কবিতাই বটে!

চেয়ার ছেড়ে কৃতান্ত মুখুজ্জে একেবারে গোবিন্দর সামনে দাঁড়ালেন। সেই অপরূপ কবিতার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—এই বেড়াল আমার মেয়ের তিনখানা বোটানি বই শেষ পাতা পর্যন্ত খেয়েছে, ওর গালে এমনভাবে আঁচড়েছে যে সাংঘাতিক ঘা হয়ে গেছে, ওর একজোড়া চশমা কাঁচটাঁচ-সমেত খেয়ে হজম করে দিয়েছে, একজোড়া ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করেছে। এই বেড়ালের দৌলতে আমার সারা বাড়িতে একখানা কাপড় আস্ত নেই, একটা কোটেরও কলার নেই। আমার একখানা কাশীদাসী মহাভারতের এক পর্ব ছাড়া বাকি সপ্তদশ পর্ব এক ঘণ্টায় সাবাড় করেছে। গেলো বারো দিনের ভেতর আমরা এক ফোঁটা দুধ খেতে পাই নি, একটুকরো মাছ মুখে দিই নি। সব ঐ বেড়ালের পেটে। অথচ যার জন্মে সাহেবপাড়া থেকে ব্যাটাকে কিনে আনলাম তার বেলায় ঢুঁঢু। একটা ইঁদুর ছুঁয়ে দেখে নি পর্যন্ত! ছোঁবে কি, রাত্তিরে ইঁদুর দেখলে ভয়ে মশারি-টশারি ছিঁড়ে আমার বিছানার মধ্যে ঢুকে আঁচড়ে-কামড়ে একাকার। শরীরে আমার এমন এক-চিলতে চামড়া নেই যেখানে ও আঁচড়ায় নি।

আস্তে আস্তে কৃতান্ত মুখুজ্জের গলা চড়তে লাগল। শেষের কথাগুলো বলবার সময় ছাদ-ফাটানো হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—সেই আপদ আমি নিজের হাতে বিদেয় করে এলাম, ফিতে দিয়ে পাথরের সঙ্গে বাঁধলাম পর্যন্ত, ভাবলাম বারো দিন বাদে আজ রাত্তিরে খেয়ে-

দেয়ে একটু শান্তিতে ঘুমুবো, তা বলে কিনা—দুর্বৃত্তের হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছি! আমাকে বলে কিনা দুর্বৃত্ত!

কৃতান্ত মুখুজ্জে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাঁ হাতে গোবিন্দর ডান কানটি ধরলেন, ডান হাতে গোবিন্দর বাঁ-গালে ধাঁই করে এক চড় কসিয়ে দিলেন। সবুর কর, এই তো কেবল কলির শুরু।

গোবিন্দর কোল থেকে আলগোছে বেড়ালটা পড়ল মেঝেয়। সেটাকে ফুটবল বানিয়ে ভদ্রলোক গোষ্ঠ পালের কায়দায় এ্যায়সা একখানা কিক্ করলেন যে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বোঁ করে উড়ে গিয়ে বেড়ালটা দড়াম করে পড়ল একটা আলমারির কাঁচে। ব্যস, যা হবার তা-ই হল। ঝনঝন, ঝনঝন, ঝনঝন।

ওদিকে সমানে চলেছে ঠাসঠাস, ঠাসঠাস, ঠাসঠাস। গোবিন্দর দু-গাল আর কৃতান্ত মুখুজ্জের দু-হাত।

প্রাণের মায়া বড় মায়া। এক-পা, দু-পা, তিন-পা, চার-পা। আমরা চারজন গুটি-গুটি দরজার কাছে এসে গেছি প্রায়। আর একটু, আর একটু। এই, এই তো, এই যে! তারপর সোজা পিছন ফিরে চোঁচা দৌড়।

দৌড়তে দৌড়তে দূর থেকে শুনলাম সেই কবিতা না কবিতার পেত্নীর মত গলা—বাঁবাঁ, আর চাঁরটে ছিঁচকে যে সটকান দিল!

পরদিন সকালে আমরা চারজন গেলাম গোবিন্দর বাড়ি। একটা আগুনের কুণ্ড জ্বেলে গোবিন্দ চুপচাপ বসে আছে। ভীমরুলে কামড়ালে যেমন হয়, গোবিন্দর সারা মুখ ফুলে ঢোল।

—আগুন জ্বেলে কী করছিস রে?

—পোড়াচ্ছি।

—কী পোড়াচ্ছিস?

—ডিটেকটিভ বই।

ছারপোকা

বরাতজোরে জলের থেকেও শস্তা দরে একখানা বাড়ি পেয়ে গেলাম। খুলে বলি।

হয়েছে কী—একখানা বাড়ি ভাড়া পাবার ভয়ানক দরকার। একজন উট্‌কো লোকের মুখে শুনলাম টালিগঞ্জে আনোয়ার শা রোডে একখানা বাড়ি নাকি খালি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলাম সেই ঠিকানায়। কিন্তু কপাল আমার, কে একজন এই আধঘণ্টা আগে এর মধ্যেই সেখানা ভাড়া নিয়ে খাট-পালং বিছিয়ে ফেলেছে। সে বাড়িতে সাকুল্যে দু-খানা জানলা, কিন্তু কী কাণ্ড, তাতেই সাত দু-গুণে চোদ্দ রঙের দু-খানা ফাস্টো কেলাস পর্দা ঝুলছে।

ঝুলুক। আবার দম নিয়ে আমি ফিরতি পথ ধরলাম।

ডান-হাতি একটা বাঁক ঘুরতেই চোখের সামনে দেখি, একটা পুরোনো আস্ত দোতলা বাড়ি। আর সেই বাড়ির সামনে একখানা চিত্তচমৎকারী নুটিশ। তাতে লেখা—না, থাক; বললে সবাই ভাববে আমি রাঁচির পাগল কিংবা কেওড়াতলার সাধু।

কেওড়াতলার সাধু মানে গাঁজায় পয়লা নম্বর ওস্তাদ। বেশ, যে যা-খুশি ভাবুক, আমি সত্যি কথা বলবোই। একবিন্দু রাখব না, ঢাকব না।

সেই নুটিশে লেখা :

টিপকল, বিজলিবাতি, স্নানঘর, রান্নাঘর, শয়নঘর ইত্যাদি-সহ দ্বিতল প্রাসাদখানা মাত্র সাতশো-এক টাকায় বিক্রয় হইবে।

ভাগ্যবান, সহৃদয়, ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা অবিলম্বে নিম্নলিখিত নাম-ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া সর্বপ্রকার অনুসন্ধান লউন। ইতি—

স্বাঃ শ্রীশান্তি দাস

৫৯৫৯, সতীন দাস রোড, কলিকাতা-২৯

এই নুটিশ পড়বার পর তিলমাত্র সময় নষ্ট করে কোন মূর্খ? সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। এই বাজারে সাতশো-এক টাকায় একটা আস্ত দোতলা বাড়ি!

লেকভিউ রোড যেখানে সাদার্ণ এভিন্যু ছুঁয়েছে, সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে বেঁকলেই শান্তি দাসের মস্ত গেট-ওয়ালা বাড়ি। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে চোখে পড়ল, খালি গায়ে বারান্দায় টুলে বসে একজন বুড়ো চাকুম-চুকুম করে বেগুন-ভাজা না কী যেন খাচ্ছে। গলা-খাঁকারি দিলাম পর্যন্ত, কিন্তু বুড়োর বয়ে গেছে!

অতএব চেঁচিয়ে বললাম—শান্তিবাবুকে একবার ডেকে দেবেন?

তখনো বুড়ো চোখ তুলল না। বললে—ডাকতে হবে না।

ডুবিয়েছে! মুখে বললাম—কেন, টালিগঞ্জের বাড়িটা কি বিক্রি হয়ে গেছে?

—উঁহু!

—তবে?

শালপাতার ঠোঙাটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বুড়ো আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর খ্যাস খ্যাস করে উঠল—আশ্চর্য কাণ্ড! বাড়ি বিক্রির নুটিশ টাঙিয়েছি বলে কি শান্তিতে একটু তেলেভাজাও খেতে দেবেন না মশাই?

এই দ্যাখো, খামকা বুড়ো চটে গেল। অগত্যা তাকে খুশি করবার জন্যেই হেঁ-হেঁ করে বললাম—ওটা তেলেভাজা বুঝি?

শুনে বুড়ো ক্রিং করে সটান টুল ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।—আপনি কি ভেবেছিলেন আমি মকরধ্বজ খাচ্ছি?

আবার তক্ষুনি বুড়ো হাঁপাতে-হাঁপাতে ধপ্ করে টুলে বসে পড়ল। কী বলব, আমি আমতা-আমতা করতে লাগলাম।

—ঠিক আছে, কিস্যু বলতে হবে না। ফালতু মিঠে কথার দরকার নেই। আমিই শ্রীশান্তি দাস। এখন কাজের কথা বলুন।

বললাম।

—বাড়ির খদ্দের? বেশ, নগদ সাতশো-এক টাকা ছাড়ুন, লেখাপড়া করে দিয়ে দিচ্ছি।

তবুও আমার মনে খচখচানি।—আচ্ছা, একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আজকালকার দিনে মাত্র সাতশো-এক টাকায়···

—ব্যস্, রোখ্কে।—বুড়ো আমার মুখের সামনে ডান হাতখানা তুলে ধরল।—আপনাকে নিয়ে চারশো-সাতান্ন জন খদ্দের আমাকে ঐ এক প্রশ্ন করেছেন। আমারও এক জবাব। আমার বাড়ি আমি সাতশো-এক টাকায় বেচি বা সাত পয়সায় বেচি, তাতে আপনাদের কী? আমার খুশি। পছন্দ হয় কিনুন, নাহয় কেটে পড়ুন। সাফ্ কথা।

—আর-একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আচ্ছা, আগের চারশো-ছাপ্পান্ন জন খদ্দেরের কেউ বাড়িটা কিনলো না কেন?

—তাদের খুশি।

—আর-একটা কথা বলব?

—বলুন।

—আচ্ছা, বাড়িটার কোনো দোষ-টোষ··

—আছে।

—কী দোষ?

—বলব না। আমার খুশি। দোষ না থাকলে ও-বাড়ি কেউ

সাতশো-এক টাকায় ছাড়ে ? মোটের মাথায়, বেশি কথার দরকার নেই। পছন্দ হয় কিনুন, নাহয় কেটে পড়ুন। আমার সাফ কথা।

এর পরে আর কথা চলে না। ঘণ্টা-দুয়েকের সময় নিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলাম। তারপর ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস ঘুরে আমার সমস্ত সঞ্চয়, আমার যথাসর্বস্ব—ছ-শো সাতানব্বুই টাকা এগারো আনা নিয়ে আবার যখন শান্তিবাবুর কাছে এলাম, তখন দুপুর প্রায় দেড়টা।

টাকা-পয়সা গুনে-গেঁথে শান্তিবাবু বললেন—আর তিন টাকা পাঁচ আনা ?

হাত কচলে হেঁ-হেঁ করে বললাম—পরশুদিন ওটা দিয়ে দেবো।

—হবে না। বাকি-বকেয়ার মধ্যে শান্তি দাস নেই।

শেষকালে তিন টাকা পাঁচ আনার জন্যে সব ভেস্তে যাবে ? একটা উপায় হবে না ? এক্ষুনি ?

ধাঁ করে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। স্যাণ্ডেল ঘেঁসটাতে ঘেঁসটাতে সোজা চলে গেলাম কালীঘাট। এক মুচির বাচ্চার কাছে পুরোনো স্যাণ্ডেল-জোড়া বেচে দিলাম নগদ আঠারো আনায়। পুরোনো জামা গেঞ্জি বেচে পেলাম দুটাকা পাঁচ আনা। ব্যস, এখন আমি বলতে গেলে, হাফ সন্ন্যাসী। পরনে কাপড়, গায়ে কাপড়ের খুঁট।

কড়ায়-গণ্ডায় পাওনা মিটিয়ে শান্তিবাবুর সঙ্গে সমস্ত লেখাপড়া পাকাপোক্ত করে যখন টালিগঞ্জে নিজের—হ্যাঁ, নিজের বাড়িতে এসে উঠলাম, তখন পরনের কাপড়খানা ছাড়া আমার নগদ সম্বল একটি দু-আনি। সেটাও কপালগুণে অচল।

মাস কাবার হতে এখনো তিন দিন দেরি। এ তিন দিন এখন চালাই কী করে ?

যাক, আজ আর কোনো হাঙ্গামার দরকার নেই। অচল

দু-আনিটি ট্যাঁকে গুঁজে নিজের বাড়ির টিপকলে পেট ভরে জল গিললাম। জলে কিসের গন্ধ রে! কেমন একটু চেনা-চেনা গন্ধ যেন! ট্রাম-বাসের সীটে কিংবা আপিসের চেয়ারে বসলে এ-রকম একটা গন্ধই তো নাকের ভেতর দিয়ে প্রায়শ মর্মে গিয়ে ধাক্কা মারে। এ গন্ধ তো পানীয় জলে থাকবার কথা নয় বাপু!

কিন্তু সাতশো-এক টাকায় বাড়ি কিনে গন্ধ নিয়ে খুঁতখুঁত করাটা বাড়াবাড়ি। সত্যি, গন্ধ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানে নেই। জলের বর্ণ থাকে না, কিন্তু তা-বলে কখনো-কখনো এক-আধটু গন্ধও থাকবে না,—এমন কথা ছাপার হরফে কোন্ পুঁথিতে লেখা আছে, শুনি?

দোতলার শোবার ঘরে একখানা কেরোসিন-কাঠের খাট পড়ে আছে। ওটা হয়ত বাড়ির সঙ্গে ফাউ। আলো নিবিয়ে চুপচাপ সেটার ওপরে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের ঘোরাঘুরি, দু-চোখ সঙ্গে-সঙ্গে বুজে এল।

কিন্তু কতক্ষণ? এপাশ-ওপাশ করলাম এক-আধটু, নিজের বাড়িতে নিজের হাতে নিজের শরীরে এলোপাতাড়ি ধাঁইধপাধপ্ তবলা বাজালাম, কিন্তু কিসের কী! সেই গন্ধ! আর তার সঙ্গে, মনে হতে লাগল, যেন একসঙ্গে এক লক্ষ ডাক্তার দুহাতে আমার শরীরে দু লক্ষ ইঞ্জেকশানের ছুঁচ ফোটাচ্ছেন।

উঠতে হল। আলো জ্বাললাম।

সর্বনাশ! খাটে, মেঝেতে, দেওয়ালে—সর্বত্র কোটি কোটি ছারপোকা!!

দুহাতে দুপায়ে বিপুল বিক্রমে চালালাম ছারপোকা-নিধন। কিন্তু কোটি কোটি বাঙালী ছারপোকার কাছে আমি তো দূরস্থান, আফ্রিকার সিংহ পর্যন্ত নস্যি হয়ে যেত, নিরস্ত্র আমি আর ক-লক্ষ ছারপোকা মারতে পারি, বলো? হায় রে, স্যাণ্ডেল জোড়াও যদি এ সময়ে থাকত!

পরদিন হাফ্-সন্ন্যাসী বেশে আপিসে যেতেই বড়বাবু বললেন,—ছি ছি, এ-অবস্থায় আপনি আপিসে না এলেই পারতেন। গুরুদশার ক-টা দিন ছুটি নিলেই হত। এ-অবস্থায় ছুটি চাইলে দিতাম না, আপনি কি আমাকে এ্যায়সা চামার ভেবেছেন, মশাই? তা ছাড়া ধরুন, এই তো আপনার মায়ের শেষকৃত্য, মা তো আর কারো একবারের বেশি মরে না!

ঠিক। বড়বাবুকে তখন সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে আমার মা বারো বছর আগে একবারই গত হয়েছেন।

—মা না হোক, বাবা। ঐ একই কথা হল। কিন্তু বলুন, বাবাই কি কারো একবারের বেশি মরে?

—হুঁ, আমার বাবাও একবারই মরেছেন। ষোল বছর আগে।

—তবে?

তখন বড়বাবুকে আগাগোড়া বৃত্তান্ত শোনালাম। পর্যন্ত বাড়ির ঠিকানাটা। শুনে বড়বাবু চমকে উঠলেন।—কী? কী বললেন ঠিকানাটা?

আবার বললাম।

—হয়েছে। সাতশো-এক টাকায় পেয়েছেন, অমনি ঝপ করে কিনে ফেললেন? আরে মিনি-মাগনায় দিলেও যে ও-বাড়ি কেউ নেয় না! ও-বাড়ির হিস্ট্রি জানেন?

জানতাম না, জানলাম। বড়বাবুই জানালেন।

গোড়ায় কার কাছ থেকে যেন দেড়শো টাকায় ও-বাড়িটা কিনেছিল এক কাবুলী। নাম মহম্মদ খাঁ, ইয়া লাস একখানা। দোতলায় খাটে গতর বিছিয়ে ঘুমিয়েছিল রাত্তিরে। কাবুলীর ব্যাটা ঘুমে অচৈতন্য, কিস্যু মালুম হল না সারা রাত্তির। পরদিন ঘুম ভাঙতে দেখে, সিঁড়ি তলায় পড়ে আছে। ভূতের কাণ্ডও যদি হয়ে থাকে তো ছুট্‌কো ভূতের বাপের সাধ্যি নেই অমন লাসকে দোতলা থেকে রাতারাতি নিচে নিয়ে আসে। তবে হ্যাঁ, বেহ্মদত্যি হলে আলাদা কথা।

কিন্তু কাবুলীর মন বললে, ও-সব কিছু না। তবে? উঠে হাঁটতে গিয়ে দেখে, এক রাত্তিরে শরীর শুকিয়ে ছুঁচ। আগের দিন পর্যন্ত হাঁটবার সময় দু-পা যেতে বেচারির গলদঘর্ম হয়ে যেত, এখন অবস্থা এমন যে ইচ্ছে হলে উড়েও যেতে পারে।

এতেও কাবুলির ব্যাটা হটে না। কুছ পরোয়া নেহি। অ্যাদ্দুরই যখন হল, শেষপর্যন্ত একবার দেখে নিতে হবে।

নামজাদা এঞ্জিনীয়র এনে বাড়িটা দেখালো। দেখেশুনে তিনি যা বললেন তা সাংঘাতিক।

প্রবাল-দ্বীপের মতো এটা নাকি একটা ছারপোকা-বাড়ি। তবে, প্রবাল-দ্বীপের সঙ্গে এটার কিঞ্চিৎ তফাৎ আছে। মরা প্রবালের শরীর দিয়ে হয় প্রবাল দ্বীপ; আর এ-বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে জ্যান্ত ছারপোকার জোরে। ইট নেই, শুধু ছারপোকা। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বাড়িটা একদম ভেঙে ফেলে নতুন করে না তুললে ছারপোকার জ্বালা থেকে বাঁচোয়া নেই। কিন্তু সেটা করতে গেলে যা খরচ লাগে তা দিয়ে বালিগঞ্জে নতুন বাড়ি কেনা চলে।

অতএব, কাবুলী কেটে পড়ল। সব জেনেশুনেও শান্তি দাস কাবুলীর কাছ থেকে হাফ্ দামে কিনে নিলে বাড়িটা। শান্তিবাবুর ধারণা, দুনিয়ায় কস্মিন কালেও গাধার অভাব হয় না।

এই পর্যন্ত ব্যাখ্যান করে বড়বাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—সত্যিই হয় না।

হঠাৎ বলে ফেললাম—কী হয় না?

—একটা হয়, আর-একটা হয় না।—বড়বাবু চেয়ারে হেলান দিলেন—শান্তিবাবুর ধারণা ঠিক হয়, আপনার মতো জীবের অভাব হয় না।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাকে 'ইয়ে' বললে কী হবে, বড়বাবু দেদার দিলদরিয়া। সত্যি বলছি, ধার-টারের কথা আমি নিজমুখে কিস্যু বলি নি, উনিই যেচে আমার হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিলেন।

আপিস-ফেরত সটান শেয়ালদ গিয়ে একটা হোটেলে সেদিন সন্ধেয় পেটের সুখ মিটিয়ে সেঁটে নিলাম। আগের রাত্তিরে বলতে গেলে দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি, এখন একটু ঘুমোতে পেলে দিব্যি হত। কিন্তু ঘুমোতে যাই কোথায়? নিজের বাড়ির অমন হিস্ট্রি শোনবার পরেও সেখানে গিয়ে ঘুমোনোর উৎসাহ কোন্ গাধার থাকে?

গাধা? ঠিক। স্বয়ং বড়বাবু একটা ভালো কথা বলেছেন—শাস্তিবাবুর ধারণা ঠিক হয়, দুনিয়ায় কস্মিনকালেও গাধার অভাব হয় না। কিন্তু কিছু টাকা-কড়ি হাতিয়ে ও-বাড়িটা গছিয়ে দিতে পারি—আমার থেকেও এমন বড় গাধার সাক্ষাৎ পাই কোথায়?

আর কোথায়, শেয়ালদ ইস্টেশনের বড় গেটের সামনেই বিশ্বনাথ মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

বিশ্বনাথ মুখুজ্জে আমার বাল্যবন্ধু। ছেলেবেলায় একসঙ্গে আমরা বাতাবিনেবু দিয়ে ফুটবল খেলতাম, পণ্ডিত মশায়ের গোরু খোঁয়াড়ে দিয়ে যে পয়সা পেতাম তা দিয়ে ভাগাভাগি করে দুজনে বাদাম খেতাম। কিন্তু বলা বাহুল্য হবে না, আমার ভাগেই বাদাম কম পড়েছে বরাবর। বিশুর সঙ্গে বিশেষ তক্কাতক্কি চলে না, ওটার গায়ে অসুরের শক্তি, উপরন্তু ওটা বিষম গোঁয়ার। আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই পিলের ব্যামো।

অনেকদিন বাদে দেখা, তবু বিশ্বনাথ কেমন যেন মুখভার করে রইল। প্রথম কথা বললে—বড় বিপদে পড়েছি ভাই!

আমিও কিছু রাজার হালে নেই, তবু বললাম—কী রকম বিপদ, শুনি?

—থাকবার আস্তানা নেই। দু-চারশো টাকা সেলামি লাগে দেব, তুই আমাকে একটা বাড়ি জোগাড় করে দে।

অ, এই কথা! দু-পাঁচশো টাকা সেলামি দিতেও রাজি? বেশ, বেশ। ঈশ্বর, তুমি যথার্থ মঙ্গলময়!

বেশি বকে লাভ নেই। মোদ্দা কথা, পাঁচশো টাকা নিয়ে বাড়িটা সে-রাত্তিরেই ওকে বেচে দিলাম। কে বলে ছুনিয়ায় আমার থেকে বড় গাধা নেই ?

কিন্তু ভুল বলা হল। বিশ্বনাথ তো পুরোপুরি গাধা নয়, অর্ধেক গাধা আর অর্ধেক বুনোশুয়োর। একটি রদ্দায় ও আমাকে অবলীলায় ত্রিশঙ্কু বানিয়ে দিতে পারে। অতএব, ভয়ে-ভয়ে থাকি। পালিয়ে বেড়াই।

বড় রাস্তায় একদিন আর-একটু হলেই প্রায় ওর মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছিলাম আর কি! সুট্ করে বাঁ-হাতি একটা গলিতে ঢুকে তারপর গলির গলি তস্য গলি করে বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচালাম।

কিন্তু এ ভাবে আর কাঁহাতক চলে ? না চললেই বা উপায় কী ?

হল উপায়। বড়বাবুই করে দিলেন। আসামের জঙ্গুলে রাজ্যে আমাদের আপিসের একটা শাখায়, বড়বাবু ওপরালাদের বলে-কয়ে, আমার বদলির ব্যবস্থা করে দিলেন। সারা জন্ম খুঁজেও বিশু আর আমার পাত্তা পাবে না। রদ্দা এবার আর তুই মারবি কাকে ?

কিন্তু ভগবানই আমায় শেষ পর্যন্ত মারলেন। উঁহু, মারবার উপক্রম করলেন। বিশুর রদ্দার থেকেও ঢের কড়া মার। কালাজ্বর।

কথায়-কথায় ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আপনাকে কোনদিন ডাঙর-ডাঙর ছারপোকায় কামড়েছে ?

হাঁ ঈশ্বর! সবই সেই ছারপোকার দৌলতে।

তিন মাস এক নাগাড়ে চিকিৎসার পর ডাক্তারবাবু ফতোয়া দিলেন, এ কাল-ব্যধি সারানো তাঁর কম্ম নয়।

শরীরের অবস্থা তখন এমন যে, যে-কোনো মুহূর্তে টেঁসে যেতে পারি। ভেবে ছাখো, সেই অবস্থায় বিস্তর মেহনত করে আবার আসতে হল এই কলকাতায়, যেখানে আমার বাল্যবন্ধু রদ্দা-বীর বিশ্বনাথ নির্ঘাত আমার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অদেষ্ট!

ধীরেন বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে অল্পবিস্তর চেনাজানা আছে, তাঁকেই 'কল' দিলাম। তিনিও সেই কথাই বললেন, এ ব্যাধির মূলে ছারপোকা।

কিন্তু আশ্চর্য ফল পেলাম ধীরেন বাঁড়ুজ্জের চিকিৎসায়। ইঞ্জেকশান-টিঞ্জেকশান না, দু-বোতল ওষুধ খাবার পর আর জ্বর নেই। বাঁচলাম।

বাঁচাবাঁচি কিসের, ধীরেন বাঁড়ুজ্জে বললেন, ঐ ওষুধ আরো পাঁচ বোতল খেতে হবে। না-হলে সাতদিনের মধ্যেই আবার চাগিয়ে উঠবে কালাজ্বর। আবার যে-কে সেই।

কিন্তু আরো পাঁচ বোতল? এক-এক বোতলের দাম একুশ টাকা দশ আনা, পাঁচ বোতল খেতে গেলে যে জীবন এমনিতেই বেরিয়ে যাবে!

যাক, আপাতত তো সামলাই, পরের কথা পরে। বিশ্বাস ফার্মেসি থেকে একটি বোতল ওষুধ বগলদাবা করে কেবল রাস্তায় নেমেছি, দেখি, বিশ্বনাথ একটা মোটর গাড়ি থেকে নামছে।

চোখাচোখি হওয়ামাত্র আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলাম। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস-ধড়াস করছে, কালাজ্বরের তাড়নায় কাহিল শরীর, বগলে সদ্য-কেনা একুশ টাকা দশ আনা দামের এক-বোতল ওষুধ, এ অবস্থায় আমি প্রাণভয়ে পালাচ্ছি। কিন্তু পালাবো কোথায়? পিছনে তাড়া করে আসছে আমার সাক্ষাৎ যমদূত—বিশ্বনাথ মুখুজ্জে।

বাব্বাঃ, আর পারি না! কিন্তু আমি থামবার আগেই আমাকে পিছন থেকে দু-হাতে জাপটে ধরল বিশু। এবার গেছি!

নিজের কানে স্পষ্ট শুনলাম বিশুর গলা—আমাকে দেখে তুই অমন করে পালাচ্ছিলি কেন?

শুনে আমি বিলকুল হাবাগঙ্গারাম মেরে গেলাম। কোনো গতিকে সে-অবস্থা সামলে নিয়ে বললাম—এক গ্লাস জল খাব!

—চ্ছোঃ !—কথাটা বিশু এক নিশ্বাসে উড়িয়ে দিলে।—জল খায় না, আইসক্রীম খাবি ?

রসিকতা না, সত্যি-সত্যি আইসক্রীম খাওয়ালো বিশু। তখন ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম, বিশুর জামা-কাপড়ের অবস্থাও ফিরে গেছে।

ওষুধের বোতলটা বগল থেকে বের করে হাতে নিতেই বিশু বললে—ওটা তুই কিনেছিস ?

—হুঁ।

—কোত্থেকে কিনলি ?

—বিশ্বাস ফার্মেসি।

—চল্, এক্ষুনি চল্। ওটা ফেরৎ দিবি।

—ফেরৎ দিলে আমার চলবে কী করে ? আমার শরীর এখনো···

—জানি, জানি, জানি। ওষুধ তোকে আমি মিনিমাগনায় দেব। পাঁচ বোতল, দশ বোতল—যত তোর দরকার।

তখন আর আমার সহ্য হল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। —বিশু, তোর মতো বন্ধুকে আমি জেনে-শুনেও অমন একটা ছারপোকার······

—ছারপোকার দৌলতেই আমি করে খাচ্ছি রে! তুই অমন ভেউ-ভেউ করে কাঁদিস নে বাছা!

—কান্না থামল, মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। মুখ আধ-হাত হাঁ। বিশু বলে কী! ছারপোকারাই তো লোকের দৌলতে খায়, ছারপোকার দৌলতে কে কবে কোথায় খেয়েছে ?

মুখের হাঁ বুজিয়ে বললাম—একটু খোলসা করে বল, বিশু!

—বলছি। বাড়িটা আমাকে বেচে তুই বে-পাত্তা হয়ে গেলি তো, তারপর আমার যা কষ্ট! কিন্তু কষ্ট না পেলে কখনো কেষ্ট মেলে ? তুই বল্ ?

—তারপর ?

—তারপর আর কী, কার মুখে শুনলাম ছারপোকার কামড়ে বিষ আছে, ওতে কালাজ্বর হয়। সঙ্গে-সঙ্গে আমার হয়ে গেল।

—কী হয়ে গেল? তোরও কালাজ্বর হয়ে গেল নাকি?

—যাঃ গাধা! আমার কালাজ্বর হতে যাবে কেন? তখন আমার মনে পড়ল প্রাচীন ঋষিবাক্য—'বিষস্য বিষমৌষধম্'। তুই সংস্কৃত বুঝিস তো?

ঘাড় নেড়ে বিশুকে বোঝালাম—বুঝি।

—তখন বুঝলি, আমি ভাবলাম—ছারপোকার বিষে যদি কালাজ্বর হয়, তো ছারপোকার বিষে কালাজ্বরের ওষুধও হবে। আলবৎ হবে। ঋষিবাক্য তো মিথ্যে হতে পারে না! কয়েকটা এক্সপেরিমেণ্ট করবার পর, ব্যস্, ওষুধটা দিব্যি বাজারে চালু হয়ে গেল। এই ওষুধের দৌলতে একখানা গাড়ি কিনেছি, বালিগঞ্জে একখানা বাড়িও কিনেছি। কিন্তু—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিশুর—কিন্তু সে-বাড়িতে একটিও ছারপোকা নেই!

—এক বোতল ওষুধে ক-টা ছারপোকা ছাড়িস?

—গুনে না, ওজন করে ছাড়তে হয়। এক সের জলে এক-পো ছারপোকা সিকিঘণ্টা সেদ্ধ করে ছেঁকে বোতলে ভরে বাজারে ছাড়ি। প্রতি বোতল পাইকিরি উনিশ টাকা সাত আনা, খুচরো একুশ টাকা দশ আনা। তবে, তোকে আমি বিনিপয়সায় দেব।

সে-কথা শুনেও আমার মনে খুব পুলক লাগল না। ধরা গলায় বললাম—বিশু, সত্যিই আমি একটা গাধা!

—জানি। কিন্তু তুই আমার আর-একটা উপকার করবি, ভাই?

—বল।

আমার দু-হাত জড়িয়ে ধরে বিশু, যাকে বলে গদগদ কণ্ঠে বললে—আমাকে তুই ও-রকম আর একখানা ছারপোকা-প্যালেস খুঁজে দিবি!

ট্রাফিক পুলিশ

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সটান এসে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

শীতকালের রাত, দশটা বেজে গেছে। খেয়েছিও বিস্তর। আর খাব না-ই বা কেন? প্রথম কলকাতায় এসেছি মাসিবাড়ি বেড়াতে। মেসোমশাই ডাকসাইটে উকিল। এন্তার টাকা-কড়ি কামাচ্ছেন। মাসিমা-মেসোমশাই দু-জনেই আমাকে খুব ভালো-বাসেন। চিঠির পর চিঠিতে ওঁদের তাগাদা। কী বৃত্তান্ত? না, তুমি একবার এখানে বেড়িয়ে যাও। অনেকদিন তোমায় দেখি না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই দেখা দিতেই এলাম। কিন্তু না এলেই বুঝি ভাল করতাম!

নতুন জায়গা, নতুন বিছানা। ঘুম কি সহসা আসতে চায়? খানিক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর প্রায় বাগিয়ে এনেছি, ঘুম এল·· ঘুম···ঘুম···

কিন্তু ঘুমের আগেই ঝাঁ করে ঘরে এল মীরা। আমার একমাত্র মাসতুতো বোন। তা বোন বলতেও মীরা, ভাই বলতেও মীরা। মাসিমা-মেসোমশায়েরও ঐ এক মীরা ছাড়া আর কেউ নেই। এক মেয়ে, কিন্তু একাই একশো। এখন মীরা কেন?

—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

—না না, ঘুমুব কেন?

—বেশ হল। খানিক গল্প-সল্প করি, কী বল?—আর বলাবলি কি, মীরা একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। অগত্যা আর শুয়ে থাকা চলে না। আমিও উঠে বসলাম।

—আচ্ছা, একটা কথা বলবে ? তুমি তো দেশ-গাঁয়ের ছেলে, তোমার সাহস-টাহস কেমন ?

একটা একরত্তি মেয়ে, গেলবার যে আই. এ পাশ করেছে, সে যদি আমাকে শুধোয়—সাহস কেমন ?—তো কী রকম লাগে, বলো ? সে-কথার কি কোন জবাব দিতে ইচ্ছে হয় ?

হয় না। আমিও মুখে কোনো জবাব না দিয়ে ডান হাতের মাস্‌ল ফোলাতে লাগলাম। ও দেখুক।

দেখেও যেন দেখছে না এমনিভাবে মীরা বললে—কই, বললে না সাহস-টাহস কেমন ?

আমি বললাম—মুখে না বললে বুঝি আর বলা হয় না ? এই যে ডুমা-ডুমা মাসল দেখছ—

এক থাবায় মীরা আমাকে থামিয়ে দিল।—ফুঃ! বলছি সাহসের কথা, তুমি দেখাচ্ছ মাসল্! আচ্ছা, সাহস আর মাসল্ কি এক কথা হল ?

—হল না ? তাহলে আর কী হবে—আমি মাসল্ নাচানো বন্ধ করে মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—আহা, হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন ?

সঙ্গে-সঙ্গে হাঁ বুজিয়ে ফেললাম।

মীরা বললে—ছাখো, আমি তোমার মাস্‌ল দেখতে চাই নি, সাহস দেখতে চাই।

বলতে কী, আমার মাথার আর ঠিক নেই তখন। ভরপেটে লেপমুড়ি লাগিয়ে সুখে নাক ডাকাবো, এক ঘুমে একেবারে সকাল ছোঁব—মনের মধ্যে এইসব বাসনা। তা ইনি এখন এলেন সাহস দেখতে! অনেক সহ্য করেছি, আর পারলাম না। মেসো-মাসির ডবল জোড়া নয়নের মণি জেনেও আর ওর সঙ্গে মিঠে মেজাজে কথা বলা গেল না।

আমি বললাম—মাঝ-রাত্তিরে তুমি আমায় জ্বালাচ্ছ কেন বাপু!

মাস্‌ল দেখালাম তো তাতে তোমার মন উঠল না! সাহস দেখতে চাইছ, কিন্তু সাহস কি দেখানোর মত বস্তু? উঁহু—মোকা পেয়ে আমি আধ্যাত্মিক লাইন থেকে তুলনা টানলাম—উঁহু, সাহস আর ভগবান—এঁদের কি চোখ দিয়ে দেখা যায়? মন দিয়ে বুঝতে হয়।

শুনেছি, ভগবানের নাম নিলেও অনেক সময় বিপদ কেটে যায়। কিন্তু আমার বেলায় যেন অন্যথা দেখা যাচ্ছে। মীরা এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিল—চল।

—আরে, যাব কোথায়? এখন, এই রাত্তিরে?

—তোমার সাহস বুঝব।

সত্যি-সত্যি মুখ খিঁচিয়ে উঠলাম—কোথায় গিয়ে বুঝবে বাপু? তোমার জন্যে আমি কি এখন হাওড়া-পুলের চূড়ায় উঠে মাঝ-গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ব? না, চিড়িয়াখানার একটা খাঁচায় ঢুকে সিংহের গলা জড়িয়ে ঘুমোব?

—না, সে-সব কিছু না। মীরা বললে—আমার একটা গাড়ি আছে, জানো? বাবা দিয়েছেন। আমার গেল জন্মদিনের উপহার।

—জানি, জানি। সব জানি।

—বড্ড ইচ্ছে করছে এখন সেটায় চেপে একটু বেড়িয়ে আসি, সেজন্যেই তোমায় অত করে বলছি। বুঝতেই তো পারো, একা-একা এই রাত্তিরে একটু কেমন···। চল, চল।

চলতে-চলতে মনে হল, আমি গাড়ি-টাড়ি চালাতে পারি না, সে-কথা আগেই পরিষ্কার করে বলে দেওয়া ভাল। তবে হ্যাঁ, মাঝপথে যদি গাড়ি বিগড়ে যায় তো তখন আমি আছি। আমি পিছন থেকে খুব ঠেলতে পারব। বলে কত ঠেললাম!

সব কথা শুনে মীরার কী হাসি!—বাঃ, তোমাকে ঠেলতে হবে কেন? এ একেবারে নতুন গাড়ি। আর গাড়ি চালানোর ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তবু মরীয়া হয়ে ভাবলাম, আর-একজনের দোহাই পেড়েও যদি এই নিদারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই। বললাম, কিন্তু এই শীতের রাত্তিরে ড্রাইভার বেচারা···

—আঃ বাজে বক্‌বক্ কোরো না। ড্রাইভার-ট্রাইভার কিছু নেই, আমার গাড়ি আমিই চালাই। নাও, ওঠো।

গাড়িতে উঠলাম। অ্যাঁ, সত্যি-সত্যিই যে মীরা ড্রাইভারের সীটে বসল! অ্যাঁ, সত্যি-সত্যিই যে মীরা গাড়ি চালাচ্ছে!

তখন আমার বুকের রক্ত হিম; কিন্তু তখনো কি জানতাম, এর পরে আরো কত আছে! তখনো কি জানতাম, এই মোটর-বিহারের তুলনায় আমার আগের হুটো প্রস্তাব (হাওড়ার পুল ও সিংহের গলা জড়িয়ে) একেবারে নস্যি?

রাস্তাঘাটের নাম-টাম আম ঠায়-ঠিকানায় বলতে পারব না। মীরা পই-পই করে বারণ করে দিয়েছে। তাছাড়া আমি কলকাতায় নতুন এসেছি, অত কি জানি?

অন্ধকার পিচের রাস্তা। গাড়ি ছুটছে শাঁ শাঁ করে। ছুঁচের ফলার মতো ঠাণ্ডা হাওয়া বিঁধছে চোখে-মুখে।

—একটু আস্তে চালালে হয় না, মীরা?

ঘাড় বেঁকিয়ে মীরা এক লহমার জন্যে আমার দিকে তাকালো। তাকানোর ভঙ্গীটাই এমন বিচ্ছিরি যে আমার ভারি অপমান লাগল। ও হয়ত ভেবেছে, স্পীড দেখে আমি ভয় পেয়েছি। না, ভয়ের জন্যে না। সে-কথাটা মীরাকে পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিলাম—তুমি যা ভেবেছ তা নয়, মীরা! ঠাণ্ডা হাওয়াটা বড্ড জোর লাগছে কিনা, তাই বলছিলাম। এই নতুন ঠাণ্ডায় একটা নিমুনিয়া-টিমুনিয়া······

ঘস্‌স্‌স্! হট্ করে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল, আর-একটু হলে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাথা ফাটাচ্ছিলাম আর-কি!

—নাও, নামো।

হিতে বিপরীত করে ফেললাম বুঝি! যে মেজাজের মেয়ে মীরা, এই অন্ধকারে অচেনা রাস্তায় আমাকে একলা নামিয়ে রেখে যদি চলে যায়, আমি কি বাঁচব? হার্টফেল হয়ে মারা যাব না? আমার বুকের মধ্যে প্যালপিটেশান শুরু হয়ে গেল। নামব?

মীরা আবার তাড়া দিল।

কাঁদো-কাঁদো গলায় বললাম—মীরা, শেষকালে কি তুমি আমাকে মেরে ফেলবে? কলকাতায় এসে তোমার পাল্লায় পড়ে বেঘোরে প্রাণ দেব মীরা?

এবার মীরা রীতিমতো ধমক দিল।—শাট্ আপ্! পুরুষ হয়ে ভয়ের চোটে কেঁদে-কঁকিয়ে একাকার করছ, তোমার লজ্জা করে না? নামো বলছি!

বিনা বাক্যব্যয়ে আমি সুড়সুড় করে নেমে পড়লাম। পিছনের দরজা খুলে মীরার হুকুমেই আবার উঠলাম। বসলাম পিছনের সীটে। সরাসরি মীরার পিছনে।

আবার গাড়ি চলল। হ্যাঁ, মীরার বুদ্ধি আছে বটে। এখন আর ঠাণ্ডা হাওয়া আমাকে তেমন ঘায়েল করতে পারছে না। হাওয়া-টাওয়ার ধাক্কা যা সামলাবার পয়লা চোটে মীরাই সামলাচ্ছে। আমার ছোট বোন হলে কী হবে, সত্যি বলছি, আমার দিদিমারও এমন এলেম ছিল না।

আশ্চর্য, রাস্তা কি শেষ হবে না? আর কতক্ষণ গাড়ি হাঁকাবে মীরা? আজ রাত্তিরে কি বিছানায় শুয়ে লেপমুড়ি লাগিয়ে একটু ঘুম···

কিন্তু আমার সাধ্য কী মীরার সামনে এ-সব কথা উচ্চারণ করি। সাঙ্ঘাতিক মেয়ে বাবা, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না! আস্ত পুঁতে ফেলবে আমাকে।

তুফান মেলে আমি এ-যাবৎ চড়িনি, সম্ভবত কোনোদিন চড়বও না। কিন্তু হলপ করে বলতে পারি, জনমনিষ্যিহীন ফাঁকা রাস্তায় শীতের রাত্তিরে এই মীরার গাড়ির থেকে সেই তুফান মেলের গতি

বেশি নয়। আর মীরা ক্রমশই জোর বাড়াচ্ছে। উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে গাড়ির গতি। যেন উড়ে যাচ্ছে। আমার সন্দেহ হতে লাগল, এটা মোটর গাড়ি নয়, মীরাও মোটর-ড্রাইভার নয়। আমার বিশ্বাস হতে লাগল, এটা এরোপ্লেন, মীরা পাইলট।

ভয়ে আমি চোখ বুঁজে ইষ্টদেবতার নাম জপতে শুরু করলাম। হে প্রভু, ভালোয়-ভালোয় আমায় দেশে ফিরিয়ে নিয়ো। তোমায় একশো-আট ছিলিম গাঁজা দেব।

কিসের কী, আরো বাড়ছে গাড়ির গতি। আর কত দূর গতি হবে গো! আরো কত দুর্গতি?

অন্ধকার চৌরাস্তার মধ্যিখানে ব্রেঁ—য়্যা—য়্যা—য়্যা—ও করে একটা বিকট আর্তনাদ তুলে খানিকটা পেল্লায় ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থেমে গেল। পাঁচ-সাত বার আমার মাথাটা ঠকাঠক করে ঠুকে গেল গাড়ির ছাদে। পলকের জন্যে মনে হল, আমি আর বেঁচে নেই।

একটু ধাতস্থ হতেই স্পষ্ট শুনলাম মীরার ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাস। কী, হল কী?

ফিসফিস্ করে মীরা বললে—চুপ, চুপ! পাশেই সাহেবদের কবরখানা। আগে আমি অনেক গল্প শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করি নি। তুমি ভূতে বিশ্বাস কর, মেজদা?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমি সঙ্গে-সঙ্গে মোক্ষম নামজপ শুরু করে দিলাম—রাম, রাম, রাম, রাম······

যদিও মনে ঘোরতর সংশয়, কে জানে সাহেবের ভূত আদপেই রাম-নামের তোয়াক্কা করে কি না, তবু ভূতের ব্যাপারে রাম নাম ছাড়া আমি আর কা-ই বা করতে পারি, বলো?

কিন্তু বাহাদুরি বটে মীরার। এই অবস্থায়, শত হোক একরত্তি মেয়ে বাপু, পলকে গাড়ি ঘুরিয়ে তীর বেগে চালালো। দড়াম করে থামল এসে একেবারে বাড়ির দরজায়। আমার তো ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

আর কোনদিকে না তাকিয়ে দুজনে চলে এলাম সটান দোতলায়। যাক, এবার ঘুমোবো।

মীরা ওর ঘরে চলে গেল। আমি এসে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুম এলো, ঘুম···ঘুম···

কিন্তু আবার মীরা এল। ঘুমের আগেই এল।

—আচ্ছা, তুমি কি ভূতে বিশ্বাস কর? তোমার কি মনে হয়, ঐ চৌরাস্তায় গাড়িটা যে একটু বেঘোরে পড়ল, তার মূলে কোনো ভূতের হাত আছে?

আমি আমতা-আমতা করতে লাগলাম।

—আমি ভেবে দেখলাম—মীরা টেবিল চাপড়ে বলল, ভূত-টুত একেবারে বাজে। আসল কারণ হল দুটো। এক নম্বর, তুমি, দু-নম্বর, পুলিশ। তোমার মতো ভীরু সঙ্গে ছিল, আর ছিল পুলিশের দোষ। অন্ধকার রাত্তিরে ঐ চৌরাস্তার মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিশ থাকলে কোনো গণ্ডগোলই হত না। ট্র্যাফিক পুলিশ নেই কেন?

কেন নেই?—আমি মাথা চুলকে বললাম—তাই তো!

—বুঝলে মেজদা, সাধারণত ওখানে ট্র্যাফিক পুলিশ থাকে। এই শীতের রাত্তিরে সেই হতভাগা হয়ত কোথাও গিয়ে পাগড়ি পেতে টেনে ঘুম লাগিয়েছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি!

মীরা গটগট করে বেরিয়ে গেল। এবার একটু ঘুমোতে পাব বোধ হচ্ছে।

কিন্তু ঘুম কিছুতে আসতে চায় না। পাঁচশো পর্যন্ত মনে মনে গুণলাম, এপাশ-ওপাশ করলাম অজস্রবার, তিনবার উঠে গিয়ে মাথায় জল দিয়ে এলাম, তবু ঘুমের দেখা নেই।

কিন্তু মীরা দেখা দিল আবার। এবার হাতে একখানা কাগজ নিয়ে এসেছে। জ্বালিয়ে খেলে!

—নাও মেজদা, দেখ। ট্র্যাফিক পুলিশ নিয়ে কড়া করে একখানা খোলা চিঠি লিখলাম। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেব। দেখ না!

দেখলাম :

মহাশয়,

পরম পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে সহরের সর্বত্র ট্র্যাফিক পুলিশ যথাবিহিত কর্তব্য করিতেছে না। বিশেষত এই শীতকালের রাত্রে। কর্তব্যে অবহেলা করিয়া কোন-কোন ট্র্যাফিক পুলিশ অন্ধকারের সাহায্যে এই শীতকালের রাত্রে স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্বক অন্যায়ভাবে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে ইহা নিশ্চিত। তাহার ফলে যান-বাহন চলাচলের যে কী পরিমাণ অসুবিধা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমি নিজে একজন ভুক্তভোগী। গতকল্য অনুমান রাত্রি এগারো ঘটিকার সময় সাহেবদের কবরখানার নিকটস্থ চৌরাস্তার মোড়ে একটি গুরুতর দুর্ঘটনায় গাড়িসমেত আমার প্রায় ভবলীলা সাঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহার একমাত্র হেতু, উক্ত মোড়ে কোন ট্র্যাফিক পুলিশ ছিল না। অবশ্য, গাড়ি চালনায় সুদক্ষ বলিয়াই আমি কোনগতিকে সামলাইয়াছি। বিবেচনা করুন তো, আমার অবস্থায় পড়িলে একজন সাধারণ ড্রাইভারের কী দশা হইত! এ বিষয়ে আমি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি

মীরা দাশগুপ্তা

আমি খানিকক্ষণ মুগ্ধ চোখে মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সত্যি, লিখেছে বটে চিঠিখানা!

মীরা বলল—বুঝলে মেজদা, এখন ঘুমোও। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাব পত্রিকার আপিসে। চিঠিখানা ছাপতে দিয়ে আসব। বুঝলে?

পরদিন সকালে মীরাই আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলল। অনেক বেলা হয়ে গেছে নাকি!

মীরাই নিজের হাতে চা করে দিল। আমি চা খাচ্ছি আর মীরা একটানা গজ্‌গজ্‌ করছে। না, ও গজগজানি আমার প্রতি নয়,

ট্র্যাফিক পুলিসের উপরেই মীরার সব রাগ। আশ্চর্য, চৌরাস্তার মোড়ে রাত্তিরে একটা ট্র্যাফিক পুলিশ নেই! এ কি মগের মুলুক?

চা খাচ্ছি, কানে শুনছি মীরার গজ্‌গজানি, চোখ বুলিয়ে পড়ছি সকালের খবরের কাগজ। খানিক বাদে এই কাগজের আপিসেই আমাকে যেতে হবে মীরার সঙ্গে। ট্র্যাফিক পুলিশের নামে নালিশ দাখিল করতে। হুঁ-হুঁ, মজা বুঝবে!

কিন্তু সেই খবরের কাগজেই একটা কালান্তক সংবাদ দেখলাম:

ট্র্যাফিক পুলিশের মৃত্যু

একটি রহস্যজনক তথ্য

গতকল্য সাহেবদের কারখানার নিকটস্থ চৌরাস্তার মোড়ে যে ট্র্যাফিক পুলিশটি ডিউটিতে ছিল, রাত্রির অন্ধকারে তাহাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে। প্রকাশ, শীতরাত্রির নির্জন পথের সুযোগ লইয়া হত্যাকারী মোটর গাড়ি চাপা দিয়া এই নৃশংস কাণ্ডটি করিয়াছে। নিহত ট্র্যাফিক পুলিশের পয়সা-কড়ি কিছু অপহৃত হয় নাই। তবে একটি তথ্য অত্যন্ত রহস্যজনক। ট্র্যাফিক পুলিশটির পাগড়িটি পাওয়া যাইতেছে না।

কে বা কাহারা কোন্ উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়াছে, এখনো তাহা জানা যায় নাই। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম। মীরা আমার মুখ চেপে ধরল। চুপ, চুপ! না, এ বিষয়ে একটি কথাও না!

স্বরচিত চিঠিখানা মীরাই কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললে। তারপর বলল—চল, গাড়িটা এক্ষুনি গ্যারেজে রেখে আসি। ইসস্, কী সর্বনেশে কাণ্ড!

গাড়িটা গ্যারেজে তুলতে গিয়ে সেই রহস্যজনক সমস্যারও মীমাংসা হয়ে গেল। পাগড়িটা! গাড়ির এঞ্জিনটার তলায় তার খানিকটা ঝুলে আছে।

একটু টানাটানি করতে পুরো পাগড়িটাই বেরিয়ে এল।

বিয়ে বিষ-অক্ষয়

এই কলকাতা শহরের ওপর আমি এমন একখানা বাড়িতে আছি যার সঙ্গে স্বর্গ ছাড়া আর কোনো জায়গার তুলনা দিতে ইচ্ছে করে না। স্বর্গ অবশ্যি আমি স্বচক্ষে দেখিনি, আর কোনদিন যে সেখানে যেতে পারব এমন ভরসাও নেই। মরে গেলেও কি আর আমার মতো ছিঁচকে লোকের স্বর্গে যাওয়া হবে ?

হবে না। এবং সেজন্যে আমি একবিন্দু দুঃখিত নই। আমার মরে গিয়েও কাজ নেই, স্বর্গে গিয়েও কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, সকলের মুখেই শুনি স্বর্গ নাকি একটা ফাষ্টো-কেলাস জায়গা, তাই অমন তুলনাটা দিলাম। বলতে কি, বাড়িটা আমার সেই সকলের-মুখে-শোনা স্বর্গের থেকেও ঢের—ঢের ভালো। অথচ বলা বাহুল্য হবে না, এ-বাড়ির আমি মালিক নই, একজন ভাড়াটে মাত্র।

ভাড়াটে এবং খুঁতখুঁতে মেজাজের লোক হয়েও আমি ভালো বলছি, অতএব নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বাড়িটা একেবারে নিখুঁত। দোতলা বাড়ি। দোতলায় আমি, আর নিচের তলায় একজন মাদ্রাজী গভর্ণমেণ্ট অফিসার। সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোক দিল্লী না ভিজাগাপট্টম বদ্‌লি হয়ে গিয়েই আমাকে বিপদে ফেললেন। এতদিনে বুঝতে পারলাম বিধাতা কাউকে চিরদিন সুখ দেন না।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক তো গেলেন, আর তাঁর জায়গায় এলেন কে-এক বাঙালী ভদ্রলোক। কাল সকালবেলা গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করব ভাবলাম। কিন্তু সেই সকালবেলাই ঘটল এক প্রচণ্ড দুর্ঘটনা।

কেবল ভোর, কিন্তু তখনো সূর্য ওঠেনি, আবছা অন্ধকার। নিচের তলায় শুনলাম এক তীব্র আর্তনাদ। মনে হল কেউ কারো গলা টিপে ধরেছে, আর প্রাণভয়ে গলা-টেপা অবস্থায় লোকটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। যাকে বলে হৃদয়-বিদারক চিৎকার।

আমি তো সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে খাট ছেড়ে নেমে একহাতে কাছা সামলাতে সামলাতে সটান নিচের তলায়। না, দু-জন নয়, একজনই বসে আছেন। হাতে একটি পেল্লায় তানপুরা, আর দু-কষ বেয়ে লাল রঙের কি যেন গড়িয়ে পড়ছে। রক্ত ?

আমি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে এ-হেন দৃশ্য দেখছি আর ভাবছি, সাত-সকালে গলা-চিরে-রক্ত-বের-করা চিৎকার যে করতে পারে, না জানি সে বস্তু কেমন হবে। না না, হবে আবার কেমন! হয়ত অ্যাদ্দিন ইনি দেশে-গাঁয়ে চৌকিদারি করেছেন এবং তখন রাত্তিরে ঘুরে-ঘুরে চোর-টোর তাড়াবার জন্যে যে চিৎকার করতেন, সে অভ্যাসটি এখনো ছাড়তে পারেন নি।

—আসুন, আসুন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, দয়া করে ভেতরে আসুন।—তানপুরায় আঙুল চালাতে চালাতে ভদ্রলোক বললেন—আপনার পদধূলি দিয়ে আমার এ গৃহ ধন্য করুন।

পদধূলি দিয়ে তার গৃহ ধন্য করলাম, বসলাম তার মুখোমুখি।

—আপনি তো মশাই প্রচণ্ড সঙ্গীত-রসিক। এই প্রাতঃকালে নিদ্রা পরিহার করে কেবলমাত্র সঙ্গীত-রস পানের নিমিত্ত আপনি ছুটে এসেছেন ? আহা, আহা! আমি ধন্য, আমি ধন্য!

আহা আহা, আর কথাবার্তার ঢঙ দেখে আমার গায়ে তো একেবারে জ্বলুনি ধরে গেল। যে থুতনি নেড়ে কথা কইছে, সেই থুতনিতে ঘুসি মারবার জন্যে ডান হাত আমার আপ্সে মুঠো হয়ে এল। কিন্তু শত হলেও ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে, অতএব পারলাম না, কিছুই পারলাম না। ভদ্রতার খাতিরেই এপর্যন্ত মুখে কিস্যু না বলে মনে মনে শুধু একটি কথা বললাম—গাধা!

ডানহাত বাড়িয়ে ভদ্রলোক রেকাবি থেকে একটা পান তুলে নিয়ে গালের মধ্যে পুরলেন, আরেকটা আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—নিন, পান খান।

—আজ্ঞে, পান আমি খাই না।

—পান খান না?—ভদ্রলোক একটু হেঁ-হেঁ করলেন—আরে মশাই, খেয়ে দেখুন। এ হচ্ছে ছেদিলালের পান। ছেদিলালের নাম শোনেন নি? একটা খেলে বুঝবেন কী দ্রব্য। তখন অন্নজল ত্যাগ করে কেবল ছেদিলালের পান খেতে ইচ্ছে করবে। নিন, ধরুন। আমি তো মশাই বলতে গেলে পানের ওপরেই আছি!

পান-টান আমার ভয়ানক বিচ্ছিরি লাগে। হাতজোড় করে অনেক বিনয়-টিনয় করে পানের থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু ভদ্রলোক চোখের এমন একখানা ভঙ্গি করলেন, যেন নিজের বোকামির জন্যে আমি রাজার ঐশ্বর্য হাতছাড়া করে ফেলেছি।

ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে পান চিবুতে লাগলেন, দু-কষ বেয়ে লাল-রঙের স্রোত নামল। আমার একটা ভুল ভাঙল। ওটা তাহলে রক্ত নয়, পানের রস।

কয়েকটা মোক্ষম ঢোক গিলবার পর ভদ্রলোক বললেন—আপনি নিশ্চয়ই আমার নাম জানেন?

জানি না, সেটা ঘাড় নেড়ে সবিনয়ে স্বীকার করলাম।

—জানেন না? সত্যি-সত্যি জানেন না?—ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন—আমার নাম জানেন না? অবাক করলেন আমাকে!

একটু চুপ করে গোটাকয়েক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে—বাঙলা দেশের মানুষ হয়ে আপনি আমার নাম জানেন না, আপনার এ-জন্মটাই বৃথা, মশাই! আমার নাম শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে গদাই। মানে, লিখবার সময় ব্র্যাকেটে গদাই লিখতে হয়।... আপনার নামটা শুনতে পারি কি?

শুনিয়ে এলাম।

তা, সেই একদিনের সকালবেলার ওপর দিয়ে গেলে তবু মন্দের ভালো ছিল। কিন্তু তা তো নয়। যতক্ষণ বাড়ি থাকি, পুণ্ডরীকাক্ষর গাধা-মার্কা চিৎকার। ক্লান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। উনি এক নাগাড়ে সঙ্গীত-চর্চা করে যাচ্ছেন। নিজের কানে ছিপি আটকে দেখেছি, বৃথা। পুণ্ডরীকাক্ষর কণ্ঠস্বর অবলীলায় ঐ ছিপি ভেদ করে আমার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ধাক্কা মারে। আমার আবার হার্টের ব্যামো, কিন্তু সে-কথা বলি কাকে ?

এ-বাড়িটাকে এতদিন মনে হত স্বর্গ, এখন মনে হয় নরকও বুঝি এত অসহ্য নয়। আমাকে যদি এ-বাড়িতে বেঁচে-বর্তে থাকতে হয় তো এ গান বন্ধ করতে হবে অথবা ওকে তাড়াতে হবে। এ আপদ যে ভগবান কোত্থেকে আমদানি করলেন !

অনেক ভেবে-চিন্তেও কোনো উপায় বের হল না, শুধু আমার মাথাটা দিনের পর দিন গরম হয়ে উঠতে লাগল, হার্টের ধড়ফড়ানিও বেড়ে গেল। আমি কি এখন লেকের জলে ঝাঁপ দেব, না গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলব ?

না, এ বিষয়ে ট্যারা ফণির সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার। ট্যারা ফণি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর মাথায় সব সময় বুদ্ধি কিলবিল করে, বিপদে-আপদে ট্যারা ফণি আমার সাক্ষাৎ মধুসূদন। দেখি একবার।

সব শুনে ট্যারা ফণি খানিকক্ষণ গুম হয়ে কি যেন ভাবল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চল্ আমার সঙ্গে।

কোথায় যেতে হবে, কী বৃত্তান্ত, ট্যারা ফণির চোখের দিকে তাকিয়ে আমার সে-সব কিছু জিগ্যেস করবার সাহস হল না। ট্যারা ফণির পিছু-পিছু চুপচাপ এলাম টালিগঞ্জের ঘিঞ্জি এক ধোপা-পাড়ায়, ছিরু ধোপার বাড়িতে।

ছিরুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ট্যারা ফণিই সব ব্যবস্থা করে দিলে।

অমন পেয়ারের গাধাগুলোর মধ্যে যেটার গলাবাজি শুনলে ছিরুর পর্যন্ত পিলে চমকায়, নগদ পাঁচ টাকা খসিয়ে সেটাকেই কয়েকদিনের জন্যে বাড়ি নিয়ে এলাম। বিষের ওষুধ যেমন বিষ, গাধার গলা শুনে তেমনি পুণ্ডরীকাক্ষর গলা যদি থামে। অন্তত ট্যারা ফণির সেই আশা। দেখা যাক।

কিন্তু হায় দুরাশা! পুণ্ডরীকাক্ষ আর গাধার দৌলতে আমার নিদ্রা গেল, আহার গেল, সব গেল; কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষর সঙ্গীত গেল না। দোসর পেয়ে তার উৎসাহ আরো চাগিয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত গাধাটাই চুপ মেরে গেল। ওর মুখে আর রা-টি নেই। পুণ্ডরীকাক্ষর গলায় যা আছে, মা শেতলার এই নিরীহ জীবটির গলায় তার আদ্ধেক এলেমও নেই। আস্তে-আস্তে বেচারি নেতিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেল। তখন উল্টে আমাকে এর জন্যে ছিরু ধোপাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ থোক সাতাশ টাকা সাড়ে দশ আনা দিতে হল। তবু কি ছিরুর দুঃখ যায়! আহা, অমন তেজী গাধাটা কিনা দু-দিনেই একেবারে বোবা হয়ে ফিরে এল!

সোজা গিয়ে ট্যারা ফণিকে আবার সব কথা খুলে বললাম। চোখ বুজে ট্যারা ফণি অনেকক্ষণ ভেবে বললে—এবার শেষ চেষ্টা। এক্ষুনি একটা রেডিও কিনতে হবে। সব সময় চড়া ভল্যুমে কলকাতা সেণ্টার খুলে রাখবি। কলকাতা শুনেও যদি ও-ছুঁচোর গান না থামে তো বুঝবি ওর গলাবাজি থামানো শিবের অসাধ্য।

ট্যারা ফণির সঙ্গে রেডিও কিনে বাড়ি তো এলাম। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই এরিয়েল-টেরিয়েল লাগানো শেষ।

ট্যারা ফণি তক্ষুনি ক্যালকাটা সেণ্টার ধরতে যাচ্ছিল, আমি বারণ করলাম—এখন থাক। ঘর তালাবন্ধ করে পুণ্ডরীকাক্ষ যেন কোথায় বেরিয়েছে, ও ব্যাটাচ্ছেলে আগে ফিরুক, তারপর।

কিন্তু ট্যারা ফণি তক্ষুনি চাবি ঘুরিয়ে দিল। চলুক, চলুক। পুণ্ডরীকাক্ষ বাড়িতে ঢুকে-ইস্তক যেন শুনতে পায়। শুনিয়ে শুনিয়ে

ওর কান পচিয়ে দিতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যেও ওকে রেহাই দিলে চলবে না। তবে যদি ওর গলাবাজি থামে, তবে যদি ওষুধ ধরে।

কলকাতা কেন্দ্রে তখন কি যেন একটা গজল না খেয়াল হচ্ছে। আহা, কী মধুর, কী মধুর! ছিরু ধোপার অমন গাধার সাতটি মিলিয়েও এমনটি হবে না। আসুক বাড়িতে, এবার পুণ্ডরীকাক্ষ টের পাবে!

গান থামল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা—এতক্ষণ আপনাদের ভীমপলশ্রী শোনালেন শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে গদাইবাবু। আবার আপনারা এঁর গান শুনতে পাবেন রাত নটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। তখন ইনি শোনাবেন······

নন্দিনী

ছেলেবেলায় ইস্কুলে আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন নিশি ভশ্চাজ্জি মশাই। বলা বাহুল্য, ইস্কুল থেকেই সংস্কৃত আমার সয় না। ওসব হিঙরিঙের বিন্দু-বিসর্গ দেখলেও কেমন যেন মাথা ঘুলিয়ে ওঠে। সংস্কৃত থেকে শতহস্ত দূরে থাকাটাই আমি ঘোরতর পছন্দ করি। অথচ তাতে পণ্ডিতমশায়ের প্রগাঢ় উষ্মা। কেলাশে ঢুকেই ওঁর পয়লা কম্মো আমাকে কিছু প্রশ্নাঘাত করা ; স্বভাবতই প্রশ্নমালার একটিরও সদুত্তর আমার মুখে অসম্ভব। তখন পণ্ডিতমশাই আপন ছাতাটির ভেতর থেকে বেতখানা বের করে আমাকে এক নাগাড়ে পিটিয়ে যান। তারপর বেতখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে আবার ছাতার মধ্যে রেখে দেন। আমার যা-খুশি হোক, বেতখানা ভালো থাকা চাই। বিস্তর কাজে লাগে ওখানা।

আর ঐ ছাতা। পণ্ডিতমশাই আছেন, অথচ ও-ছাতা নেই— এ-দৃশ্য আমার কল্পনাতীত। কেলাশে ঢুকে ছাতাটা পণ্ডিতমশাই ব্ল্যাকবোর্ডে ঝুলিয়ে রাখেন। পণ্ডিতমশায়ের নস্যির ডিবে, একফালি ন্যাকড়া-বাঁধা পয়সা-কড়ি আর বেতখানা ঐ ছাতার মধ্যে থাকে। যখন যেটা দরকার হয় বের করে নেন।

পণ্ডিতমশায়ের মুখে শুনেছি, ওঁর মাথার ওপর দুয়ের বেশি আর কিছু নেই। এক— ছাতা, দুই—ভগবান।

কিন্তু ছাতা, ভগবান—এসব কিছু নিয়ে গল্প নয়। গল্পের মূলে

তিনজন। এক—আমি, দুই—পণ্ডিতমশাই, তিন—পণ্ডিতমশায়ের গোরু। এক—অভাজন, দুই—গুরুজন, তিন—গোরুজন।

বলছি।

কি-একটা শব্দরূপ না সন্ধি-টন্ধি জিজ্ঞেস করেছেন পণ্ডিতমশাই। আমি তো কে-না-কে, কেলাশের মিনিমুখো ভালো ছেলেদের অবধি মুখে রা নেই। মিথ্যে বলব না, দু-চার ঘা প্রায় সকলের পিঠেই উনি লাগিয়েছেন, কিন্তু আমার বেলায় একেবারে অন্য 'চিকিচ্ছে'। মুখে পর্যন্ত আমাকে প্রশ্নটাও শুধোলেন না, শুধু হাতে-বেতেই চালালেন। চলুক, চলুক।

কিন্তু চলা আর থামে না। অল্প-সল্প বেত আমার এতকালে সহ্য হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিন আর হল না। আমার চোখ ফেটে কয়েক ফোঁটা জল বেরুলো, কপালে ঘাম ফুটল ফোঁটা-ফোঁটা।

পণ্ডিতমশাইও গলদ্‌ঘর্ম। হাপরের মতো হাঁপাতে-হাঁপাতে উনি আরও—আরও জোর চালালেন। আমাকে মেরে কোনোদিন যা পারেন নি, আজ তা পেরেছেন। মারের চোটে আজ আমার চোখে জল ফুটেছে, কপালে ঘাম বেরিয়েছে। পণ্ডিতমশাই উল্লসিত হয়েছেন নিশ্চয়ই।

দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে সেই যম-যন্ত্রণা ভোগ করছি। আর কত, কতক্ষণ চলবে কে জানে! হে ঈশ্বর, পণ্ডিতমশাই একটু ঠাণ্ডা হোন!

হলেন। মারের চোটে আমি যে কাতর, পণ্ডিতমশায়ের ক্ষান্ত দেবার সেটা কোনো কারণ নয়। এমনিতেই হাঁপানিতে ভুগছেন, তাই এর বেশি আর পারলেন না পণ্ডিতমশাই। পারলেন না বলে উনি যার-পর-নাই দুঃখিত। এবং সে দুঃখের কথা পণ্ডিতমশাই কেলাশের মধ্যে তারস্বরে ঘোষণাও করে দিলেন। তাছাড়া আরও বেশি পরিশ্রম হলে ঐ মহামূল্যবান বেতখানারও হয়ত স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা।

দু-হাতে মুখ ঢেকে আমি প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। বলতে গেলে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছি, সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঠেলে কান্না বেরুতে লাগল।

ঘণ্টা পড়ল, ছাতাসমেত পণ্ডিতমশাই চলে গেলেন, সংস্কৃতর কেলাশ শেষ হল, সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল কেলাশের ছেলেদের সান্ত্বনা।

অতুল বললে,—অমন হাপুস চোখে কাঁদিসনে ভাই! আজ তো আমরা সকলেই বেত খেয়েছি, কিন্তু তোর মতো এমন···

অসহ্য, অসহ্য! বললাম,—মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস নি। তোদের পিঠে পড়েছে হোমিওপ্যাথি, আমার পিঠে অ্যালোপ্যাথির বাপ। আর কাউকে আমার মতো পেটালে আর দেখতে হত না, এতক্ষণে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হত। মা গো!

অতুল চুপ। কিন্তু বঙ্কু মুখ বেঁকিয়ে বললে,—আবার বীরত্ব দেখাচ্ছেন! পড়া না পেরে মার খেয়েছে, লজ্জা হয় না?

হয়। শুধু লজ্জা কেন, রাগও হয় সাংঘাতিক। ধাঁই করে বঙ্কুর গালে একখানা থাপ্পড় কষিয়ে দিলাম। গালে হাত চেপে বঙ্কু ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল। একমাত্র পড়া-শোনা বাদ দিলে ওরা আমার সঙ্গে কিসে পারে, শুনি? গায়ের জোরের কথা ছেড়ে দাও, আমার যে-সব বুদ্ধি খেলে, তার সিকির সিকি ওদের কারো মাথায় আসে?

বুঝি, সবই বুঝি। এই বুদ্ধির জন্যেই আমার ওপর পণ্ডিত-মশায়ের এত ইয়ে—। মানে, হাতে-নাতে তো আর ধরতে পারেন না, তাই সংস্কৃতর কলে পিষে আমাকে ঠাণ্ডা করার মতলব। আরে, অতোই শস্তা?

যে-করে হোক, পণ্ডিতমশাই কেলাশে ঢুকে খুঁজে-পেতে আমাকে বের করবেনই। তা না হলে ওঁর হাতের সুখ হয় না। আমারও

আবার ছুটির পর বাইরে গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের নন্দিনীকে খুঁজে বের না করলে মনের কিংবা মুখের সুখ হয় না।

নন্দিনী ছাড়া পণ্ডিতমশায়ের ত্রিসংসারে আর কেউ নেই। ইস্কুলের মাঠেই সাধারণত বিকেলের দিকে নন্দিনীকে পাওয়া যায়। তখন নন্দিনী সেখানেই হাওয়া খায়, ঘাস খায়। যদিও নন্দিনী

পণ্ডিতমশায়ের নিজস্ব গোরুর নাম, তবু তাকে 'গোরু' বললে পণ্ডিত-মশাই সহ্য করেন না।

দিনকয়েক আগে পণ্ডিতমশাই বলেছেন,—নাম ধরে না ডেকে কেউ কোথাও আমার নন্দিনীকে 'গোরু' বললে নন্দিনী প্রাণে বড্ড ব্যথা পায়। বাড়ি ফিরে আমাকে সে-কথা বলে দেয় পর্যন্ত।

আশ্চর্য কথা! আর, কী কাণ্ড—সেদিন সকালেই আমি খানিকক্ষণ একা পেয়ে নন্দিনীকে 'গোরু, গোরু' বলেছি। সর্বনাশ, এর মধ্যেই সত্যি-সত্যি পণ্ডিতমশাইকে গিয়ে লাগিয়েছে নাকি!

তবু যেন কেমন বিশ্বাস হতে চায় না। শেষ পর্যন্ত থাকতে না

পেরে বলতে হল,—আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, গোরু কি সত্যি কথা বলতে পারে ?

—পারে।

—আপনি নিজে কখনো গোরুর বাক্য শুনেছেন ?

—এখনো শুনছি। এবং এখনি আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে অন্তত একটা গোরুকে কিঞ্চিৎ···

সত্যিই যৎকিঞ্চিৎ। আজ যা পেয়েছি তার তুলনায় সেদিনের মার কিছুই না।

তাহলে আমার ওপর পণ্ডিতমশায়ের এত রাগের কোনো নিগূঢ় কারণ আছে ? আছে বৈকি। সারা শহরে এতকালের মধ্যে কেউ কখনো পণ্ডিতমশায়ের নন্দিনীকে খোঁয়াড়ে দেয়নি। হালে দুবার নন্দিনী খোঁয়াড় ঘুরে এসেছে। পণ্ডিতমশাই নিজেই গিয়ে শেষে মুক্ত করে এনেছেন।

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি থেকে সেই খোঁয়াড় পাক্কা তিন মাইল রাস্তা। দুবার নন্দিনীকে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে আনতে পণ্ডিত-মশাইকে হাঁটতে হয়েছে সাকুল্যে বারো মাইল রাস্তা, ফাইন দিতে হয়েছে দু-দু-গুণে চার টাকা।

যে ব্যক্তিরা নন্দিনীকে দু-বার খোঁয়াড়ে দিয়ে গেছে, খাতা দেখে খোঁয়াড়-ওয়ালা দু-বারই তাদের নাম-ধাম অবধি বলে দিয়েছে। প্রথম বার বলেছে—ননীমাধব সারখেল,—হেডমাষ্টার, কদমপুর হাই ইস্কুল। দ্বিতীয় বার আর-এক নাম—নিশি ভট্টাচার্য,—সংস্কৃত পণ্ডিতমশাই, কদমপুর হাই স্কুল। নন্দিনীর অপরাধ ? না, হেড-মাষ্টার বাবুর তিনটে কুমড়োগাছ খেয়েছে প্রথম বার, আর পণ্ডিত-মশায়ের গোটা ফুলবাগানটাই নাকি হজম করে দিয়েছে দ্বিতীয় বার।

এখন ব্যাপার হয়েছে কী—হেড়মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে দুব্বো-ঘাস ছাড়া আর কোনো গাছ নেই। যদি থাকতও, তিন-তিনটে কুমড়ো গাছই যদি থাকত এবং নন্দিনী তা খেয়েও ফেলত,—তথাপি

হেডমাষ্টার মশায়ের পক্ষে পণ্ডিতমশায়ের নন্দিনীকে খোঁয়াড়ে পাঠানো সম্ভব হত না। আর, বাগান দূরের কথা, ফুলের একটি পাপড়িও পণ্ডিতমশায়ের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে জন্মায় না। যদি জন্মাতোও, গোটা ফুলবাগানই জন্মাতো এবং নন্দিনী তা হজম করে ফেলত— তথাপি পণ্ডিতমশায়ের পক্ষে নিজের নন্দিনীকে খোঁয়াড়ে পাঠানো কী প্রকারে সম্ভব? না না, মূলে অবশ্যই কোনো গুরুতর রহস্য আছে।

দু-টিপ নস্যি নিয়ে পণ্ডিতমশাই খোঁয়াড়-ওয়ালাকে পাকড়াও করেছেন তখন—তুমি হেডমাষ্টার বাবুকে চেনো?

—আজ্ঞে না।

—পণ্ডিতমশাইকে চেনো?

—আজ্ঞে না।

আস্তে-আস্তে খোঁয়াড়-ওয়ালার কাছে সংবাদ নিলেন পণ্ডিত-মশাই। গোরু যে খোঁয়াড়ে দিয়ে যায়, তার কথামতোই গোরুর অপরাধ এবং গোরুর ব্যবহারে যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের নাম-ধাম পাকা খাতায় ওঠে। তাহলে কথা হল, নন্দিনীকে খোঁয়াড়ে দিয়ে গেল কে?

খোঁয়াড়-ওয়ালা তার কী জানে? অতএব পণ্ডিতমশাই নিজেই মুলুক-সন্ধান চালালেন। কেমন করে কে জানে, পণ্ডিতমশাই শেষে সন্দেহ করলেন, কিংবা বলি নিঃসন্দেহ হলেন,—এ-কীর্তি আমি ছাড়া আর কারো নয়।

কিন্তু প্রমাণ কই? আরে বাপু, আমি কি তেমন কাঁচা ছেলে?

শুধু অনুমানের ফলেই আমাব পিঠের চামড়া প্রায় উড়ে যাবার দাখিল, হাতে-নাতে প্রমাণ পেলে কি রক্ষা থাকত? অনুমান অবশ্য নির্ভুলই করেছেন, কিন্তু তাতে কী? পণ্ডিতমশাই আমার যন্ত্রণা বাড়াচ্ছেন, আমিও ওঁর যন্ত্রণা বাড়াবো। কেলাশে মার খাই, খারাপ

লাগে ; কিন্তু গোরু খোঁয়াড়ে দেবার পরে খোঁয়াড়-ওয়ালা প্রত্যেক বার যে দু-আনা পয়সা দেয়, ফিরতি পথে তা দিয়ে হিন্দু-রুটি আর ঝাল বাদাম কিনে খাই, দিব্যি লাগে।

পিঠ এখনো পোড়াচ্ছে। কিন্তু না, আজ আর নন্দিনীকে ঐ খোঁয়াড়ে দেবো না। কমপক্ষেও এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে আর-একটা খোঁয়াড় আছে। আজ সেখানে। এবার পণ্ডিতমশাই এক ধাক্কাতেই পাঁচ দু-গুণে দশ মাইল হণ্টন করুন। চমৎকার হবে।

কিন্তু কপাল খারাপ হলে যা হয়। বিকেলে নন্দিনীর পাত্তা নেই। ইস্কুলের মাঠে নেই, চক্কোত্তিদের বাগানে নেই, হাসপাতালের পিছনেও নেই। গেল কোথায়? উঁকি দিয়ে দেখলাম পণ্ডিতমশায়ের গোয়ালে পর্যন্ত নেই। তবে? পণ্ডিতমশাই এখন নির্ঘাত দাবার আড্ডায়, নন্দিনী গেল কোথায়? সঙ্গে নিয়ে দাবা খেলতে গেলেন নাকি? হেডমাষ্টার মশায়ের বাড়িতেও একবার লুকিয়ে দেখে এলাম। হেডমাষ্টার আছেন, অঙ্ক-স্যার আছেন, পণ্ডিতমশাই আছেন, কিন্তু না, নন্দিনী নেই। গেল কোথায়? তবে কি আমার আগেই আর কেউ খোঁয়াড়ে দিতে নিয়ে গেল? আমাকে ফাঁকি দিয়ে আর কেউ ফাউ দু-আনার হিন্দু-রুটি আর ঝাল-বাদাম খাবে?

কে কী খাবে, সন্ধ্যার পর ভাঙা মনে গেট খুলে বাড়ি ঢুকতে দেখি নন্দিনী আমাদের বাগানে দাঁড়িয়ে দিব্যি ঘাস খাচ্ছে। ভগবানকে উদ্দেশ করে একটা কবিতা আছে না—'—যখন যেদিকে চাই, তোমার করুণারাশি কেবলই দেখিতে পাই'—ভালো কবিতা কিন্তু! একেবারে খাঁটি কথা।

সময় কম। তাড়াতাড়ি নন্দিনীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাইলখানেক আসার পরে ভেবে দেখলাম, আরো তাড়াতাড়ি কাজটা চুকিয়ে আসা ভালো। ব্যস্, নন্দিনীর পিঠে দড়ির বাড়ি মারি, নন্দিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে, আমিও সঙ্গে-সঙ্গে হু-হু করে ছুটি।

মুস্কিল, আবার মুস্কিল। আকাশে মেঘ করে এল, হাওয়া উঠল,

দেখতে-না-দেখতে ভীষণ ঝড়। মাথা গোঁজবার জায়গা নেই ধারে-কাছে, চারদিকে খালি মাঠ আর মাঠ। ঝড়ের সঙ্গে হুড়মুড় করে বৃষ্টিও এসে গেল।

নন্দিনী তখনো বেদম দৌড়চ্ছে! আমিই বা থামি কী করে? কাঁটার আঁচড়ে হাঁটু পর্যন্ত জ্বলছে, পায়ের একপাটি স্যাণ্ডেল নিরুদ্দেশ। প্রায় আধমরা অবস্থায় কোনগতিকে নন্দিনীকে সামলে পাঁচ মাইল পেরিয়ে সেই খোঁয়াড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। নন্দিনীকে খোঁয়াড়ে দিয়ে দু-আনার হিন্দু-রুটি আর ঝাল-বাদাম খেতে-খেতে আবার ফিরতি পথ ধরলাম। বৃষ্টি নেই, ঝড়ও না। কিন্তু পথে পড়ে আছে ছেঁড়া-খোঁড়া ডাল-পাতা, জমে আছে জল-কাদা। বিচ্ছিরি!

পথের বর্ণনা আর দেব না। বহু কষ্টে কোনগতিকে যখন ফিরলাম, তখন পড়লাম একেবারে বাবার মুখোমুখি। আজ গেছি!

কিন্তু আশ্চর্য, বাবা মার-ধোরের ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন—এদিকে কী বিপদ হয়েছে জানিস?

আমি ঘাড় চুলকোতে লাগলাম। অর্থাৎ, জানি না।

—নন্দিনীকে কে বা কারা নিয়ে গেছে।

আবার নন্দিনী! সেরেছে!

—পণ্ডিতমশায়ের নন্দিনীর কথা বলছ বাবা?

—পণ্ডিতমশায়ের না—বাবা বিমর্ষভাবে বললেন—আমার নন্দিনী। আজ বিকেলে হঠাৎ ছাপ্পান্ন টাকায় নন্দিনীকে পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে কিনে নিলাম। সামনের বাগানটায় রেখে বেরিয়ে গেছি, ফিরে এসে দেখি, নেই! নির্ঘাত কোন বদলোকের কাণ্ড। আগেও নাকি দু-দু-বার নন্দিনীকে…! যাক গে। যে খোঁয়াড় থেকে হোক, আজ রাত্তিরেই ফিরিয়ে আনা চাই। যা, এক্ষুনি যা!

নটবর পাল

আমাদের নটবর পাল টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার। অতএব বিনে মাইনে, আপখোরাকি। ফলে যদি পিসিমার মেজাজ ঠিক না থাকে, পিসিমাকে কি দোষ দেওয়া যায়?—যায় না।

আবার এদিকেও দেখ। আমাদের নটবরেরই বা কী দোষ? নেহাৎ ঊনিশটি বার না হোক, পাঁচটি বছর ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে! যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, কতবার 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর' কবিতাটি আউড়েছে। 'একবার না পারিলে দেখ শতবার'—মাত্র পাঁচ বার দেখেছে। বড়মামা রায় দিয়েছেন—ঘোড়ার ঘাস কাট গে, পড়াশোনা তোমার কম্ম নয়। অতএব—আমাদের নটবর পালের কী দোষ!

কিন্তু যাই বল, আমাদের নটবর পালের গুণ, যোগ্যতাও আছে। ভালো লাইনস্ম্যান্, ভালো বাজার করে, চুল ছাঁটাই সম্পর্কে রুশ জার্মানদের কায়দা-কানুন ভালো জানে, যুদ্ধের খবর তার নখ-দর্পণে, ভালো ঘামাচি চুলকোতে পারে এবং আরো অগুনতি গুণ।

কিন্তু হলে কী হবে? চাকরি-বাকরি নেই, মানে অনেক জুতোর তলা খুইয়েও জোটাতে পারে নি।

তাতে অবশ্যি নটবরের বেশি হায়-আফশোষ নেই। কত যোগ্য লোককেই তো পয়সার অভাব পোয়াতে হয়! না-হলে মাইকেলের মতো কবি কিনা হাসপাতালে বিনে চিকিৎসায়—

কিন্তু পিসিমার গঞ্জনা আর বুঝি সহ্য হয় না! আরে আফটার অল, নটবর পালের গায়ে তো আর মোষের চামড়া নেই যে পিসিমার বাক্যবাণগুলো তা ভেদ করে কিছুতেই ঢুকতে পারবে না!

—বলি, একটা ফুটো পয়সা আয়ের মুরোদ নেই, কিন্তু ওদিকে তো দেখি ষোল আনা চাই। ওদিকে তো পান থেকে চুন খসলে বাবুর রাগের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না! দিন-রাত্তির পিসিমার এই এক বুলি।

প্রেস্টিজ বলে মানুষের একটা পদার্থ আছে। আর, নটবর পালও নেহাৎ অমানুষ নয়! সুতরাং—

সুতরাং নটবর পাল নগদ একটা তামার পয়সা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল যে—যদি পয়সা আয় করে ফিরতে পারি তবেই ফিরব, নইলে আর নয়। নইলে দেব লাইফটাকে ঐ কলকাতার গুণ্ডাদের হাতে। এ্যায়সা জীবন থাকবার চেয়ে না থাকা ঢের-ঢের ভাল। গুণ্ডার আড্ডা খুঁজতে হবে না, রায়টের জের তখনও থামে নি।

পিসিমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল নটবর। আড়চোখে তাকালো তার দিকে। উঁহুঁ, এমনিতরো কথায় ভিজবার মতো চিঁড়ে পিসিমা নন। উল্টে তিনি বললেন—থাক নটবর, ঢের হয়েছে, আর কেন? ও-সব কথা শুনতে-শুনতে কানটা অনেকদিন থেকেই কেমন-কেমন করছিল; অনেক দিনের পুরোনো যোগেন্দির কবরেজ, ভাবলাম তাকে একবার দেখাই। ও—মা, যা ভেবেছি তাই! দেখেই বললেন যে পচা কথা শুনতে-শুনতে নিঘ্‌ঘাত কানে পোকা ধরেছে। তা বাছা, যা করেছ, করেছ—ও-সব কথা বলে আর আমার কানের যন্ত্রণাটা বাড়িয়ো না। দোহাই তোমার!—পিসিমা আবার আগের মত নির্লিপ্তভাবে চোখ বুজে, মাথা নেড়ে, দাঁতে মিশি ঘষতে লাগলেন।

সেদিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করেই নটবর দু-পাটি দাঁতে একটা জোর কলিশন করলে।—উফ্‌!

কিন্তু না, যা ভেবেছ তা নয়। এতই কি নিরুপায়? কিছুই কি করবার ক্ষমতা নেই আমাদের নটবরের?

এই তো কত মুহুরি-মুছুদ্দি, মুচি-মেথরের ছেলেরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের

প্রকাণ্ড কাণ্ডকারখানা করে ফেলছে। কত কামাচ্ছে, কত হাতাচ্ছে —অন্তত হাতড়াচ্ছে হাতাবার জন্যে। যত সব আঙুল এই ধমকে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নটবর?—যাই বল আর তাই বল, সব-কিছু রয়েছে এই তিন ইঞ্চি কপালটুকুর মধ্যে। না-হলে গোবেচারি গোবর্ধনও মিলিটারি হচ্ছে, এ-আর-পি হচ্ছে, সিভিক-গার্ড হচ্ছে—শুধু নটবরই জুলফক্কা-জুলফুক্কি? নটবরের অদৃষ্টেই যত ফাঁক-ফোকর!

নাঃ, রাতারাতিই কিছু একটা করতে হবে! কিন্তু উপায়? ম্যাজিক? ভোজবাজি?—ইম্‌পসিবল! অ্যাবসার্ড!—কিন্তু বুদ্ধিমান-দের দপ্তরে অমনি ধরনের কোন শব্দ নেই এবং যেহেতু আমাদের নটবর পাল নিজেকে যথেষ্ট বিজ্ঞ বিবেচনা করে সুতরাং মনে মনে সে অন্য পন্থা খুঁজল। খুঁজতে-খুঁজতে ঘাম বেরুলো, কপাল কুঁচকোলো, চোখ ফেটে জল এল। কিন্তু তবুও কোন উপায় মাথায় এল না।

তা বলে পিসিমার মুখের ঐ কথাগুলোর পরে কিছুতেই আর বাড়ি থাকা চলে না! ঘেন্না-পিত্তি বলে নটবরেরও একটা জিনিস আছে তো! আগে তো পথে বেরুনো যাক, উপায় শেষে যা হবার হবেই।

যাকে বলে, এক বস্ত্রে পথযাত্রা। অনেক জায়গা ঘুরল, অনেক অফিস-কাছারি। কিন্তু কোথাও নাকি আর লোকের দরকার নেই।

খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, মাথার ওপর প্রকাণ্ড বোশেখী সূর্য। কলকাতার রাস্তায় পিচ গলছে, নটবরের গায়ে সারা দুপুরের ধুলো-বালি। পেট ভরে বিশুদ্ধ পানীয় জল খেয়ে শ্রান্ত শরীরে খানিক জিরিয়ে নেবার জন্যে সে একটা বটগাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসল। নিজের অজান্তে অমনি ভাবেই কখন এক সময় দু-চোখে রাজ্যির ঘুম নেমে এল।...

ঘুম যখন ভাঙল রাত হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ, ফাঁকে-ফাঁকে এক-আধটা তারা চিক-চিক করছে। অমাবস্যার অন্ধকার।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নটবর উঠে দাঁড়ালো। তাকালো একবার আকাশের দিকে। হুড়মুড় করে বৃষ্টি এল বলে!

তাড়াতাড়ি নটবর পা চালালো। গুণ্ডাদের আস্তানায়ই সে যাবে। এমনি বিষাক্ত জীবন রাখার চাইতে না রাখা শতগুণে ভালো। ঐ অঞ্চলের অন্ধকার গলিগুলি আজকাল যা হয়েছে, সন্ধ্যার পরে নেহাৎ ভুলেও কেউ হাঁটতে সাহস পায় না।

সেইরকম একটা গলিতে ঢুকে পড়ল আমাদের নটবর পাল। যার পিতার নাম ৺রাইচরণ পাল, পিতামহের নাম ৺দিগম্বর পাল, প্রপিতামহের নাম ৺বটকেষ্ট পাল। যার পিতা ভূতের ভয়ে হার্টফেল করেছেন, পিতামহ চোরের ভয়ে অক্কা পেয়েছেন, প্রপিতামহ তিনটে তুলোর বালিশ চাপা পড়ে ভবলীলা সংবরণ করেছেন।

যাক গে, যেতে দাও। গতস্য শোচনা নাস্তি। যা বলছিলাম।

হ্যাঁ, আমাদের নটবর এগোতে লাগল, বেশ বিজয়ী বীরের মতো ভঙ্গি। যার জীবনের ভয় নেই তার আবার কিসের পরোয়া!

স্যাঁতসেতে দুর্গন্ধে নটবরের নাক ঝালাপালা, কিন্তু তথাপি সে পথচ্যুত হয় না। 'যেতে হবে, যেতে হবে, যেতেই হবে রে'—কৃষ্ণ-চন্দ্রের কীর্তনের কলিটা বেশ কায়দা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল নটবর।

কিছুদূর এগোতেই একটা বস্তি প্যাটার্নের টিনের চালা। টিমটিমে হ্যারিকেন জ্বলছে, ইয়া-ইয়া অনেকগুলো চেহারা। নটবরকে দেখেই তাদের চোখগুলো শিকারী কুকুরের মতো চক্‌চক্ করে উঠল। আর তাদেরই একজন এগিয়ে এল দরজার কাছে।

নটবর তো বেপরোয়া। লোকটাকে দেখে তার ধারণা হল যে সে-ই সর্দার। সোজা সে তাকে বললে—এই সর্দার, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

আশ্চর্য! এ-ই যে সর্দার, একথা এই লোকটা জানলো কী করে!—দলের অন্য লোকগুলো সত্যিই তাজ্জব বনে গেল।

—আমি যে সর্দার, তা তুমি বুঝলে কী করে?—কী কর্কশ গলা লোকটার!

কিন্তু নটবর কি ঘাবড়াবার পাত্র! মুচকি হেসে সে বললে—এটুকু বুঝবার মতো শক্তিও আমার নেই, তুমি তাই বলতে চাও সর্দার?

—তা আমার কাছে কী দরকার?

—যা দরকার তা তো তোমার হাতে দেখছি না হে! কই, না, কোমরেও তো গোঁজা নেই!—নটবর অনেকটা হতাশ হয়ে গেল।

—কী? কিসের কথা বলছ?—সর্দারের চোখদুটো জ্বলতে লাগল।

—আর কিসের কথা বলব? ছোরা, তোমার ছোরার কথা বলছি সর্দার!

—কেন?

এই সামান্য ব্যাপারটা এরা বুঝতে পারছে না? এত খুন-খারাপি করছে, আর এটুকু বুঝছে না? সত্যি বলতে কী, নটবরের বিরক্তি হল। ভ্রূ-কুঁচকে সে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে,—কেন? কেন আবার কী? তোমার সেই ছোরাখানা এনে আমার বুকের মধ্যে সড়াৎ করে ঢুকিয়ে দাও। আমাকে—

কিন্তু এ কি ম্যাজিক? ভোজবাজী? স্বপ্ন? গাঁজা? সিদ্ধি? না…?

সেই সর্দার একেবারে নটবরের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। —এবারকার মত ক্ষমা করুন কর্তা, অনেকদিন থেকে শুনেছি বটেক যে একজন নতুন গোয়েন্দা লেগেছে আমাদের পেছনে। তা আপনিই যে সেই তিনি, তা এতক্ষণে বুঝলুম কর্তা! এবারকার মতো আমাদের মাফ করুন!

নটবর পাল তো হতভম্ব! এ আবার কোন্ ফ্যাসাদ রে বাবা!

—না হে না, সত্যি বলছি আমি গোয়েন্দা-ফোয়েন্দা কিছু নই। দেখ তুমি আমাকে তল্লাসি করে যদি কিছু পাও! রিভলভার দূরের কথা, যদি একটা—

নটবরের কথা শেষ হবার আগেই সর্দার একেবারে হাত জোড়

করে, মাথা নেড়ে, জিভ কেটে বললে—না কর্তা, অমনি বাক্যি মুখেও আনবেন না। আমরা ছোটনোক, গুণ্ডা-বদমাস সব, আমরা কি হুজুরকে তল্লাসি করতে পারি? হুজুরের পায়ের কানা আঙুলের নখের যোগ্য নই আমরা, এবারকার মত আমাদের ক্ষমা করুন কর্তা!

তারপরেই সর্দারের সে কী কান্না! এইমাত্র ছেলে মরেছে যেন! —দয়া করে পুলিশ-টুলিশগুলোকে যেতে বলুন এবারকার মতো, আপনার পায়ে পড়ি কর্তা।

এ কী বিপদ! নটবর এক লাফে পিছু সরে এল—আঃ, এ-সব পা-ধরাধরি কেন! বলছি আমি ওসব গোয়েন্দা-ফোয়েন্দা কিচ্ছু নই। পুলিশ-টুলিশ কেন, একটা চৌকিদারও নেই ধারে-কাছে কোথাও, অযথা তোমরা আমাকে—

কিন্তু তবুও কি সর্দার ছাড়ে! কান্না কি তার এত সহজেই থামবার? ইনিই যে সেই গোয়েন্দা, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায়! ঠিকমত পাকা-পোক্তভাবে তৈরি না হয়ে কি কেউ এমনি আসে! এমনি এসে কোনো গাধাও নাকি নিজের প্রাণ সর্দারের ছোরায় খোয়াতে চায়! ওসব তো গোয়েন্দা-সাহেবের একটু রসিকতার ভান!

—হুজুর, আমাদের এবারের মতো ক্ষমা করুন—সর্দারের কান্না উথলে উঠল—আর আমাদের মতো গুণ্ডা-বদমাসদের জন্যে এই মেঘলা ঘুটঘুটে রাত্তিরে আপনার কত পরিশ্রম হল! সেজন্যে আমাদের ক্ষমা করুন হুজুর। আজ দয়া করে তাড়াতাড়ি আপনি আমাদের ক্ষমা করে যান হুজুর—আপনি ছাড়া আমাদের বাঁচাবার আর কেউ নেই! দলের দিকে একবার একটু তাকিয়ে সর্দার হুকুম করলে—এই, কে আছিস, সিন্দুক খুলে তিন হাজার টাকার একটা তোড়া আর বড় রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আয়,—জলদি—!

তিন হাজার টাকার তোড়া এল, ট্যাক্সি এল।

সর্দার স্বয়ং টাকার তোড়াটা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে গেল, আমাদের নটবরের পা ধরতে-ধরতে এনে ট্যাক্সিতে চাপালো। বার-বার মিনতি

করে অনুরোধ জানালো—আমাদের এবারকার মত ক্ষমা করুন কর্তা—সাধ্যমত আপনার পায়ের কাছে এই তিন হাজার টাকার প্রণামী দিলাম—আমাদের দোষ-ত্রুটি এবারকার মত—

আমাদের নটবর পাল হতভম্ব একদম! শুধু ড্রাইভারের কথার জবাবে একবার বললে—ভবানীপুর।

স্বপ্ন? ভোজবাজী? আলাদীনের প্রদীপ?—কে জানে, যার জানবার সে তো হতভম্ব!

এর পরের ঘটনা যার যা খুশি ভেবে নিতে পারো, আমার কিচ্ছু বলবার নেই। বলবার বাকি আছে শুধু নটবর পালের একটু কথা, অল্প একটু, যৎকিঞ্চিৎ। তোমরা হয়েছ কি না জানিনে, তবে কাহিনীর এ পর্যন্ত আমি অ্যাত্তটুকুন আশ্চর্য হইনি। আশ্চর্য হয়েছি সেদিন নটবরের বৈঠকখানায় গিয়ে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের এই নটবর পাল চালবাজপুরের মহারাজার কায়দায় চায়ে এক একটু চুমুক দিচ্ছে আর পাড়ার বেকার ছেলেদের বিনিপয়সায় উপদেশ বিলোচ্ছে—তোমরা সব ইয়ং মেন, পয়সার জন্যে অত মাথা ঘামাও কেন বল দেখি? আমার মতো বুদ্ধি খাটাও, দেখবে পয়সা এসে গেছে। পয়সা রোজগার এমন একটা কষ্ট কী হে! পয়সা পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে, শুধু একটু মগজের ঘিলু খাটিয়ে ঘরে নিয়ে এলেই হল—ব্যস্। এই দেখ না আমি কেমন—!

ধন্বন্তরী

আশ্চর্য কাণ্ড!

আসলে অসুখটা যে কী তা-ই ধরতে পাচ্ছেন না গদাধরবাবু। বোঝো তাহলে ব্যাপারখানা! যে-সে ডাক্তার নয় তো, গদাধর মিত্র স্বয়ং—জি. ডি. মিটার এম-বি., এল. ডি. টি. এস (ফিলাডেলফিয়া), আর. জেড (হ্যালিফ্যাক্স)। যাঁর নাম শুনলে খোঁড়ারও নাকি পা গজিয়ে ওঠে।

স্টেথসকোপের মুখটাকে আর একবার নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলেন গদাধরবাবু। না, কই! ঠিক আছে বলেই তো মনে হচ্ছে সব! শুয়ে-শুয়ে যতরকম করা যায় কিছুই বাকি রাখেন নি—এই আধঘণ্টাখানেক ধরে। ফুস্‌ফুস, লিভার, নাড়ি-ভুঁড়ি, পাকস্থলী, কিড্‌নি—কোথায় যে বেকায়দা বুঝতে পাচ্ছেন না। অথচ এমন অসহ্য যন্ত্রণা—!

গদাধর মিত্রের কপালে এই শীতেও ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠল। আর কতক্ষণই বা? সবই তো ফুরোলো বলে! গদাধরবাবু চোখ বুঁজলেন। চোখের কোল বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল বালিশে। অস্পষ্ট গলায় বড় ছেলেকে বললেন—যে-রকম বলি লিখে যাও,—আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির—

চোখে আঁচল চেপে গিন্নি এবার হু-হু করে কেঁদে উঠলেন। যাকে বলে মড়া-কান্না! গদাধর চমকে উঠলেন। তাহলে সত্যিই মরে গেলেন নাকি তিনি? নিজের গায়ে চিমটি কেটে পরখ করলেন। কই না, এখনো তো মরেন নি! কিন্তু আর কি আশা আছে?

—ডক্টর দত্তগুপ্তকে একবার ফোন করব বাবা? কানের কাছে মুখ নিয়ে শিবেন চিবিয়ে-চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল একবার। ততক্ষণে, কে জানে কেন, যন্ত্রণাটা খানিক পড়ে গেছে গদাধর মিত্রের। (এতদিন রোগ নিয়ে খেলা করেছেন ডাক্তার, এবার রোগ একটু ডাক্তারকে নিয়ে খেলা করছে নাকি?) সে যাক গে। কথাটা শুনে এমন চোখ করে তাকালেন গদাধর, যে ছেলের আর দু-বার দত্তগুপ্তর নাম উচ্চারণ করবার সাহস রইল না।

—এখনো বয়স অল্প আছে তোমার শিবেন, এখনো অনেক কিছু দেখতে-শুনতে বাকি। আমার তো জানতে বাকি নেই কোন্ ব্যাটার মগজে ক-তোলা ঘিলু!...যদি ডাকতেই হয় তো একবার ব্রজেন চাটুজ্জেকে ডাক। হুঁ! একমাত্র সে-ই পারবে যদি পারার হয়।

—অ্যাঁঃ, এ কী প্রলাপ শুরু হল! ব্রজেন চাটুজ্জে! যার প্যাণ্টে কম করেও পাঁচটা তালি, জুতোয় সাতটা; যার ভুঁড়ি বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়লেও কোট সেই একটাই আছে, ফলে শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস বাধ্য হয়েই যার বোতামগুলো খুলে রাখতে হয়!—সেই ভাঙা-স্টেথসকোপ-গলায় হাতুড়ে ডাক্তার ব্রজেন চাটুজ্জে!

গদাধর একটু থেমে বললেন—অবাক হচ্ছ? হুঁ। কিন্তু আমরা একসঙ্গেই ডাক্তারি পড়তাম হে! ফাইন্যালে ও-ই ফার্স্ট হয়েছিল কিন্তু। আর আমি ফোর্থ।

—তখন ফোর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এখন চৌতলা বাড়ি মিত্তিরের, আর চাটুজ্জের একতলাও জোটে নি!

শাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গদাধর আবার মিহি গলায় বললেন, —যদি কাউকে ডাকতে হয় তো ব্রজেনকে।

তবুও একটুকাল দাঁড়িয়ে রইল শিবেন। কিছু বলতে সাহস করল না, কিন্তু একবার সন্দেহ হল—অসুখটা বাবার পেটে, না মগজে!

•

ব্রজেন ডাক্তার কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু

একটু পরেই সে-ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন—আচ্ছা তুমি যাও, আমি একটু বাদেই আসছি।

তবু একটু আপত্তি তুলল শিবেন—গাড়ি নিয়েই এসেছি একেবারে।

—না না, বললাম তো একটু পরে যাব।—গলাটা একটু বেশি চড়াই হয়ে গেল বুঝি।

কি-একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলো শিবেন। আট আনা ভিজিট দিয়েও কেউ ডাকে না এমন ডাক্তার—তার আবার তেজ দেখ না!

কিন্তু আজ তার কাছেই দরকার, আজ ভিজে বেড়ালের মতোই থাকতে হবে।

শিবেনকে বিদায় দিয়ে ব্রজেন চাটুজ্জে মন ঠিক করে ফেললেন। সেই ছাত্রজীবন থেকে গদাধর তাঁর সঙ্গে শুধু শত্রুতাই করে এসেছে। অত ভালো ছাত্র হয়েও জীবনে তিনি কিছুই করতে পারেন নি, সে কার জন্য? ঐ গদাধরেরই চক্রান্তে। পদে পদে অপমান, পদে পদে ষড়যন্ত্র। গদাধরই তো তাঁর জীবন মরুভূমি করে দিয়েছে! কী শাস্তি দেওয়া যায়? কী শাস্তি আবার! একেবারেই দাও না গদাই মিত্তিরের ভবলীলা সাঙ্গ করে! ডাক্তারের নিজের অসুখ হলে সে আর ডাক্তার থাকে না। সাপের বিষ দিলেও ওষুধ বলে চেটে খেয়ে নেবে। আর—

আর ওষুধ যদি না ধরে তবে কি ডাক্তার দায়ী?

ব্রজেন চাটুজ্জেকে দেখেই গত্থ মিত্তির কেঁদে ফেললেন। চাটুজ্জে মনে-মনে বললেন—কাঁদো, কাঁদো, প্রাণ খুলে কেঁদে নাও এ-জন্মের মতো। আর কতক্ষণ বা আছ!

—আমাকে ভাই বাঁচিয়ে দে। তুই যা চাস—

কিন্তু ভুতের মুখে রাম নাম শুনে গলবার পাত্তোর ব্রজেন চাটুজ্জে

নন। তবু, মনের কথা তো মুখে বলা যায় না! হাতের ওপর আস্তে একটু আঙুল ছুঁইয়ে বলতে হল—চাওয়া-পাওয়ার আছে কী? তোকে সারানোই তো আমার সব পাওয়া!

মনে-মনে বললেন—হ্যাঁ, সারাতে হবে বৈকি, দফাটিই সেরে দিতে হবে!

খসখস করে একটা মিকশ্চার লিখে দেন ব্রজেন চাটুজ্জে। বলেন—আজ রাত্তিরে দু-দাগ খাইয়ে দিও, তারপরে কাল ভোরে—।

ভোর হবার দেরি আছে ঢের। কিন্তু কিছুতে দু-চোখের পাতা এক করতে পাচ্ছেন না ব্রজেন চাটুজ্জে। একা-একা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে বুকের ভেতরটা।

সাধারণ পেট-ব্যথার রোগী.—তাকে দিয়েছেন কিনা ক্যানসারের ওষুধ!—গোখরো সাপের বিষ থেকে যা তৈরি! এতক্ষণে হয়ত কাজ শেষ হয়ে গেছে! চলে গেছে হয়ত সটান কেওড়াতলায়! কিন্তু শত্তুরের তো শেষ নেই চারদিকে, এখন আবার পুলিশের হাঙ্গামা না হলে বাঁচোয়া!

ফড়েপুকুরের ব্রজেন চাটুজ্জের ঝুরঝুরে বাড়ির সামনে চকচকে গাড়ির থেকে অত সকালে হাসিখুশি মুখে নামলেন স্বয়ং গদাধর মিত্তির। আর তাঁকে দেখে পিলে চমকে গেল চাটুজ্জের, মাথার চুল লাফিয়ে লাফিয়ে খাড়া হয়ে উঠল। রাম, রাম, রাম, রাম! পতিত-পাবন সীতারাম!

কিন্তু কই! নাঃ, ভূত হলে এতক্ষণে মিলিয়ে যেত নির্ঘাত। দস্তুরমত এসে হতভম্ব ব্রজেন চাটুজ্জের ডান হাতখানা ধরে একখানা রামঝাঁকুনি দিলেন জলজ্যান্ত গদাধর মিত্তির। তারপর সারা মুখে পেটেন্ট একটি অমায়িক মধুর হাসি ছড়িয়ে বললেন—আমি তখুনি বলেছিলাম না! যদি কেউ আসল অসুখ ধরতে পারে তো ব্রজেন

আমাদের। আমারও যেন অমনি মনে হয়েছিল একবার, তবে তুই একেবারে ঠিকই ধরেছিলি। কেবল উঠতি ক্যানসার কিনা, সেজন্যে দু-দাগ ওষুধেই কাজ হয়ে গেছে। দেখছিস না, এক রাত্তিরেই কেমন ঝরঝরে হয়ে গেছি?